বিশ্বের উপাদান

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫৮ ॥

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

৯১. ওড়িয়া সাহিত্য

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

৯২. অসমীয়া সাহিত্য

ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন

৯৩. জৈনধর্ম

ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

৯৪. ভাইটামিন

শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়

৯৫. মনুস্তত্ত্বের গোড়ার কথা

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

৯৬. বাংলার পালপার্বণ

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ও লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতী যুগশিক্ষার সহিত সাধারণমনের যোগসাধনের এই কর্তব্য পালনে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০-১৩৫৮ সালে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ৯৬ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

বিশ্বের উপাদান

শ্রীচারুচন্দ্র-ভট্টাচার্য

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৫০ কার্তিক
পুনর্মুদ্রণ ১৩৫১ মাঘ, ১৩৫৯ পৌষ

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম।
+২. ১+২. ১

সূচীপত্র

অণু-পরমাণু

খ্রীস্টজন্মের দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বে বৈশেষিকদর্শন-প্রণেতা কণাদ তাঁহার এক কল্পনা ব্যক্ত করেন যে, প্রতি পদার্থ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার সমষ্টিমাত্র। এই সকল কণিকার নাম 'পরমাণু'। কণাদ সূত্র করিলেন—

নিত্যম্ পরিমণ্ডলম্। ২০।১।৩। ইহারা অবিনশ্বর।

তিনি এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও বিচার করেন।

খ্রীস্টজন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে গ্রীসদেশের দার্শনিক ডিমক্রিটস্ অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। তিনি কণিকাগুলির নাম দিলেন 'অ্যাটম', গ্রীকভাষায় যাহার অর্থ হইল অবিভাজ্য। ডিমক্রিটস্ বলিলেন যে, বুঝিবার সুবিধা অনুসারে আমরা মিষ্ট তিক্ত, গরম ঠাণ্ডা, রং, এইসব কথা ব্যবহার করি—কিন্তু অ্যাটম ও শূন্য এই লইয়া ব্রহ্মাণ্ড।

রবার্ট বয়েল ও নিউটন এই কণিকাবাদ সমর্থন করেন। প্রত্যেক গ্যাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার মধ্যে সব সময়ই বিকর্ষণ আছে, নিউটন এইরূপ কল্পনা করিতেন এবং তিনি মনে করিতেন যে, এই বিকর্ষণের ফলে গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

গত শতাব্দীর প্রারম্ভে ড্যাল্টন পদার্থের গঠন সম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করিলেন। একটি মৌলিক পদার্থকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া চলিলে উহা শেষ অবধি এমন অবস্থায় গিয়া দাঁড়াইবে যখন উহাকে আর ভাঙা চলিবে না। এই অ্যাটম বা পরমাণু সম্বন্ধে ড্যাল্টন বলিলেন যে, একটি

মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি হুবহু সমান; তাহাদের ওজন, তাহাদের গুণাবলির মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই; বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন; যখন রাসায়নিক মিলন ঘটে তখন পরমাণুগুলির মধ্যেই মিলন সংসাধিত হয়।

এই মিলনে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থের সৃষ্টি হয় তাহারা হইল 'মলিকিউল', 'অণু'; এই অণু হইল যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ। একটা উদাহরণ লওয়া যাক। এক চিমটি লবণ লইয়া ভাগ করিতে করিতে উহা এমন অবস্থায় গিয়া ঠেকিবে যখন লবণের গুণাবলি বজায় রাখিয়া আর উহাকে ভাঙা যাইবে না। ইহা হইল লবণের অণু। এই অণুকে আর ছোট করা চলে না, কিন্তু এইবার তড়িৎ সাহায্যে উহাকে ভাঙিয়া যাহা পাওয়া যাইবে তাহা হইবে এই লবণ-অণুর উপাদান—বিভিন্ন পরমাণু। এই পরমাণুগুলির মধ্যে আর লবণত্ব নাই। একটি উপাদান হইল সোডিয়ম, বেশী পরিমাণে উহা বেশ নরম, ছুরি দিয়া কাটা যায়, অগ্নিকাণ্ড বাধায়। আর-একটি ক্লোরিন; বেশ ঝাঁঝালো গ্যাস, জল পরিষ্কার করে, কাপড়কে ধব্‌ধবে সাদা করে, বিপক্ষ সৈন্যকে মারিয়া ফেলে। যৌগিক পদার্থের অণুর সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি কল্পনা করিতে হইল যে, অনেক মৌলিক পদার্থেও দুই বা ততোধিক পরমাণু জোট বাঁধিয়া অণু হিসাবে বসবাস করে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অণুরাই অংশ গ্রহণ করে। অণু-পরমাণুর আমদানি হইল রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহের মীমাংসার জন্য এবং ইহাদের সাহায্যে অনেক প্রাকৃতিক ব্যাপার সুষ্ঠুভাবে মীমাংসিত হইল। এইবার দেখা গেল যে, ইহারা বাস্তব পদার্থ, ইহাদের অস্তিত্ব আছে; ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদের আয়তন আছে, ভর (mass) আছে। কত বড় সে আয়তন, ব্যাস কত, ভর কত, এ সবের হিসাব হইল।

লর্ড কেল্‌ভিন এক টুক্‌রা সোনা পিটাইয়া উহাকে এত পাতলা করাইলেন যে, উহার বিপরীত দিকের জিনিস দেখা যায়; পানের খিলিতে যে সোনার তবক মোড়া থাকে তাহার তুলনায়ও উহা অনেক পাতলা। হিসাবে দেখা গেল যে, কেলভিনের পাতেও ৫০টির উপর অণু-স্তর আছে। আরও পাতলা কিছু পাওয়া যায় না কি? প্রকাণ্ড একটি পাত্রে জল আছে; জলের উপর খুব ছোট একটি তৈলবিন্দু ছাড়িয়া দেওয়া হইল। জলের উপর ঐ তেলের একটি পর্দা পড়িয়া গিয়া উহাতে লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি রং দেখা গেল; খুব বেশী যেখানে পাতলা হয় সেখানে রং আর দেখা যায় না, স্থানটা কালো হয়। পর্দার এইখানটা কতটা পুরু, সেই হিসাব হইতে অণুর আকারের একটা হিসাব মিলে। অন্যান্য অনেক পরীক্ষার দ্বারাও হিসাব হইল; দেখা গেল, একটি অণুর ব্যাস একটি সেন্টিমিটারের ৫ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। এইবার উহার ভর বাহির হইল। হিসাবে মিলিল একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন—

·০০০০০০,০০০০০০,০০০০০০,০০০০০০১৭ গ্রাম্‌।

বিভিন্ন দিক দিয়া বিভিন্ন পরীক্ষায় ঐ একই ফল দাঁড়াইল। এখন বিজ্ঞানীরা জোর করিয়া বলিতে পারেন যে, একটি শহরের লোকগণনায় যে পরিমাণ ভুল থাকে এসব হিসাবে ভুলের পরিমাণ তদপেক্ষা কম।

একটি অণুর ব্যাস, একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন, সংখ্যায় যাহা দাঁড়াইল তাহা মানবের কল্পনার বাহিরে। উহাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে নানারূপ উপমার সৃষ্টি হইল। ব্যাস সম্বন্ধে একটি উপমা এই যে, একটি ক্ষুদ্র জলকণাকে যদি পৃথিবীর আকারে বড় করা যায় তবে ইহার অভ্যন্তরস্থ এক-একটি অণু এক-একটি ফুটবলের আকার ধারণ করিবে। অ্যাস্‌টন একটি চমৎকার হিসাব দিয়াছেন। এক

গ্লাস জল লও; কল্পনায় মনে কর, এই জলের প্রত্যেক অণুর গায়ে একটি করিয়া লেবেল মারিয়া দেওয়া হইল। এই জল এখন সমুদ্রের জলের সহিত মিশাইয়া দাও; অপেক্ষা কর যতদিন পর্যন্ত না পৃথিবীর সমস্ত মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, নদনদীর জলের সহিত এই জল সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায়। এইবার সমুদ্র বা নদী হইতে এক গ্লাস জল লও। এখন দেখিবে, তোমার সেই আগেকার লেবেলযুক্ত অন্তত দু-হাজার অণু এই গ্লাসের জলে আসিয়াছে। পরমাণুর ভরের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে সেখানে কোনও উপমাও মানব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

এই পৃথিবী, ঐ সূর্যগ্রহতারকা, ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু ভৌতিক পদার্থ আছে সবই পরমাণুর সমষ্টি-মাত্র। মোটের উপর বিশ্বে কত রকমের মৌলিক পদার্থ আছে? ৫০, ৬০, ৭০, ৮০—বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ৯২টিতে দাঁড়াইয়াছে; তন্মধ্যে ৯০টির সহিত বিজ্ঞানী বিশেষভাবে পরিচিত। এই ব্রহ্মাণ্ড ঐ ৯২টি রকমের পরমাণু লইয়া গঠিত। স্থানে স্থানে উহারা মৌলিকভাবে বিদ্যমান, বেশীর ভাগ যৌগিক ভাবে অবস্থিত। মৌলিক পদার্থ মাত্র ৯২টি, কিন্তু মানুষ প্রায় ৪ লক্ষ বিভিন্ন রকমের যৌগিক পদার্থের সন্ধান পাইয়াছে। মৌলিক পদার্থের মধ্যে দেখা যায় যে, হাইড্রোজেন সর্বাপেক্ষা হালকা, ইয়ুরেনিয়ম সর্বাপেক্ষা ভারী। মৌলিক পদার্থের অধিকাংশই সাধারণ অবস্থায় কঠিন, কতকগুলি গ্যাসীয়, এবং খুব অল্পসংখ্যক তরল অবস্থায় বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, লৌহ, অ্যালুমিনিয়ম, সিলিকন খুব বেশী পরিমাণে পৃথিবীতে ছড়াইয়া আছে, খাইতে শুইতে বসিতে আমরা ইহাদের সাক্ষাৎ লাভ করি। পক্ষান্তরে রেডিয়ম, ঈট্রিয়ম, ক্রিপ্টন প্রভৃতির পরিমাণ খুবই কম। সমস্ত পৃথিবী হইতে এক পাউণ্ড রেডিয়ম পাওয়া দুষ্কর।

একে একে অনেকগুলি মৌলিক পদার্থ যখন আবিষ্কৃত হইল তখন বিজ্ঞানী উহাদের মধ্যে কোনো শ্রেণীগত সাদৃশ্য আছে কিনা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বরের পর্দায় যেমন সাতটা অন্তর সাদৃশ্য আছে, আণবিক ওজনে সাজাইয়া মৌলিক পদার্থের মধ্যেও অনেকস্থলে সেইরূপ সাদৃশ্য দেখা দিল; যেমন পোটাসিয়ম, সোডিয়ম, লিথিয়ম, সাতঘর পর পর আছে এবং ইহাদের গুণাবলির সাদৃশ্য আছে। মেণ্ডেলিফ এই গবেষণায় তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিলেন। কয়েকটি অনাবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থের জন্য স্থান ছাড়িয়া রাখিয়া মেণ্ডেলিফ দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে, এইসব মৌলিক পদার্থকে একদিন না একদিন পাওয়া যাইবে; তাহাদের গুণাবলি কি ধরনের হইবে মেণ্ডেলিফ সে- সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন। আজ বাংলাদেশের অর্থসচিব যদি ১৯৬৮ সালের বজেট প্রস্তুত করেন এবং ১৯৬৮ সাল যখন শেষ হইবে তখন যদি দেখা যায় যে ২৫ বৎসর পূর্বে প্রস্তুত বজেট-অনুযায়ী আয়-ব্যয়ের পাই পয়সাটি অবধি মিলিয়া গিয়াছে, সেটা যতটা আশ্চর্যের বিষয় হইবে সেইরূপ হইল যখন বিজ্ঞানী দেখিল যে মেণ্ডেলিফের কথার অনুরূপ মৌলিক পদার্থ একে একে আবিষ্কৃত হইয়া মেণ্ডেলিফ-নির্দিষ্ট শূন্যস্থানগুলি অধিকার করিল।

মৌলিক পদার্থের মধ্যে কয়েকটি আছে, যেমন হিলিয়ম, জিনন, নিয়ন প্রভৃতি যাহারা একলষেঁড়ে, কাহারও সহিত মিশিতে চায় না। অনেকেই কিন্তু মিশুক; প্রকৃতিতে তাহাদের মিলন ঘটিতেছে, আবার মানুষও তাহাদিগকে মিলাইতেছে। আমরা যখন শ্বাস লই, আপনা হইতেই রাসায়নিক মিশ্রণ ঘটে; আবার যখন সলফিউরিক অ্যাসিডে দস্তা দিই, এই মিলন আমরা ঘটাই। মিলিবার আসক্তি কোথাও মৃদু, কোথাও তীব্র; এবং যেখানে তাহারা মিলিতে চাহে না বিজ্ঞানী

সেইরূপ অনেকস্থলে জোর করিয়া মিলন ঘটাইয়া নব নব যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করিয়া জগতের কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধিত করিতেছেন। একটা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। ১৮৯৮ সালের ইংলণ্ডের ব্রিস্টল শহরে এক অধিবেশনে উইলিয়ম ক্রুক্‌স্‌ সভাপতির আসন হইত বলেন, "আজ ইংলণ্ড ও পৃথিবীর সমস্ত জাতি এক মহাবিপদের সম্মুখীন; শীঘ্রই তাহাদের খাদ্যের অভাব হইবে; লোক বাড়িতেছে, কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ বাড়িতেছে না; জমি যাহা দিবার তাহা দিতেছে, কিন্তু জমির দিবার পরিমাণ নির্ভর করিতেছে প্রকৃতির খেয়ালের উপর।" কিন্তু দেখা গেল, জমি হইতে বেশী আদায় করিয়া লওয়া যায় যদি জমি শোরা প্রভৃতি সার হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া লয়। একটা হিসাব হইল, বৎসরে ১২০ লক্ষ টন শোরা যদি ভূমিতে দেওয়া যায় তো ভূমির উর্বরতা বাড়িয়া গিয়া পৃথিবীর শস্য দেড়গুণের উপর বৃদ্ধি পায়। এইবার কথা হইল যে, এই হারে যদি মাটির ভিতর হইতে শোরা লওয়া যায় তো পৃথিবীর শোরা আর কত দিন! শোরার একটি উপাদান হইল নাইট্রোজেন, আর নাইট্রাজেন বাতাসের প্রধান উপাদান। বাতাসের এই নাইট্রোজেন লইয়া কি পরীক্ষাগারে শোরা প্রস্তুত করা যায় না? জার্মানির রসায়নবিৎ হাবার শোরা প্রস্তুতের এক নূতন উপায় আবিষ্কার করিলেন। বাতাসের নাইট্রোজেন এবং জলের হাইড্রোজেন বেশী উষ্ণতায় ও প্রচণ্ড চাপে রাসায়নিক মিলনে অ্যামোনিয়ায় পরিণত হইল, আর এই অ্যামোনিয়া হইতে শোরা প্রস্তুত হইতে লাগিল।

ড্যাল্‌টনের সময়ে ফিরিয়া আসা যাক। ড্যাল্‌টন তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রচার করিবার দশ বৎসর পরে প্রাউট বলিলেন, ব্রহ্মাণ্ডের মূলে আছে একমাত্র হাইড্রোজেন-পরমাণু, অন্যরকম পরমাণুর সম্বন্ধে এইমাত্র বলা

যায় যে, উহারা কয়েকটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর জোটপাকানো অবস্থা-মাত্র, আর কিছু নয়। কথাটা শুনিতে লোকের ভাল লাগিল। এতদিন দার্শনিকেরাই বহুর মধ্যে একেকে দেখিয়াছেন; আজ যদি বিজ্ঞানী এই বৈচিত্র্যময় ব্রহ্মাণ্ডের মূলে একের সন্ধান পান তবে মানবের মন একটা তৃপ্তিলাভ করে। প্রাউটের মতের যাচাই হইল। মনে করা যাক, ক্লোরিন-পরমাণু। প্রাউটের মতে একটি ক্লোরিন-পরমাণুর যখন কতকগুলি হাইড্রোজেন-পরমাণুর সমষ্টিমাত্র, তখন একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর ওজনের তুলনায় একটি ক্লোরিন-পরমাণুর ওজন একটি পুরাপুরি সংখ্যা হইবে, উহাতে কোনও ভগ্নাংশ থাকিবে না। আর, শুধু ক্লোরিনই বা কেন, প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের আণবিক ওজন পূর্ণসংখ্যক হইবে। পরীক্ষায় দেখা গেল, সেরূপ নাই। প্রাউটের সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইল। পরিত্যক্ত হইল বটে, কিন্তু শতবর্ষ পরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রাউটের মত পরিত্যাগ করিবার মূলে ছিল একটি কথা; বিজ্ঞানীরা সেই সময় নিঃসংশয়ে ড্যাল্‌টনের এই কথাটি মানিয়া লইয়াছিলেন যে, একটি মৌলিক পদার্থের সব পরমাণুগুলি হুবহু এক, তাহাদের মধ্যে কোনো রকমের পার্থক্য নাই। কিন্তু শেষে দেখা গেল, আছে। কিন্তু সে কথা যাক।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ অববি বিজ্ঞানীর নিকট বিভিন্ন রকমের পরমাণু বিশ্বের মূল উপাদান বলিয়া পরিগণিত রহিল। তাহার পর বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নূতন যুগ দেখা দিল।

ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন

১৮৫৩ সালে প্যারিস শহরে ম্যাসন নামে এক ব্যক্তি ব্যারো-মিটারে পারদের উপরে যে শূন্যস্থান থাকে তাহার মধ্যে একটি শক্তিশালী আবেশকুণ্ডলী (induction coil) হইতে বৈদ্যুতিক ক্ষরণ (discharge) পাঠাইলেন। স্থানটি অভূতপূর্ব-সুন্দর আলোকে রঞ্জিত হইল। ১৮৫৯ সালে প্লকরও এইরূপ পরীক্ষা করিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি অনেকে নানা রকমের কাচের নল প্রস্তুত করিলেন, সেগুলির মধ্য হইতে বায়ু নিষ্কাষণ করিলেন, কেহ কেহ তন্মধ্যে খুব অল্প পরিমাণে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন অক্সিজেন প্রভৃতি গ্যাস ছাড়িয়া দিলেন; এইবার নলের মধ্যে রুম্‌কর্ফ্‌-কুণ্ডলী হইতে তড়িৎ-ক্ষরণ পাঠানো হইতে লাগিল; অদৃষ্টপূর্ব বিভিন্ন রঙের সুদৃশ্য আলোকরাশি নলগুলিকে ভরাইয়া দিল। বিভিন্নরকম নলে বিভিন্ন প্রকারের আলোক সম্পাতের সৃষ্টি করিয়া সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইলেন জাইস্‌লার; আজও ঐ-সকল নল 'জাইস্‌লারের নল' নামে পরিচিত। এই-সকল পরীক্ষা নূতন সন্দেহ নাই এবং চমকপ্রদও বটে, কিন্তু ইহার মূলে যে কোনও সিদ্ধান্ত নিহিত আছে তাহা কেহ জানিল না। জানিল না, কিন্তু বর্তমান কালে পদার্থ-বিদ্যার যে নূতন যুগ আসিয়াছে এই-সব পরীক্ষাতেই তাহার সূচনা হইল।

এক পরীক্ষা আর-এক পরীক্ষার পথ খুলিয়া দেয়। এইবার কাচের পাত্রের মধ্যে দুইদিকে দুইখানি ধাতব চাকতি প্রবেশ করাইয়া ধীরে ধীরে পাত্র হইতে বাতাস বাহির করিয়া লওয়া হইতে লাগিল এবং

চাকতি দুইটি রূম্‌কর্ফ-কুণ্ডলীর সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইল। তড়িৎ-ক্ষরণ হইতে লাগিল, এদিকে বাতপম্প (air-pump) চলিতে লাগিল। কিছু পরে দেখা গেল, একটি সরু রক্তাভ আলোকরেখা কড়্‌কড়্‌ শব্দ করিতে করিতে এক চাকতি হইতে আর-এক চাকতি অবধি প্রবাহিত হইতেছে। বায়ু-বহিষ্করণ চলিতে লাগিল। আলোক-রেখাটি এখন আর নিরবচ্ছিন্ন নহে, টুকরা টুকরা হইয়াছে; দুইদিকে দুইটি স্থান আলোকশূন্য। বায়ু আরও বাহির হইতে লাগিল; নলের মধ্যে এখন আর আলোক নাই, তবে কাচের পাত্রের উপর সবুজবর্ণের আলোক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এইসব দেখা গেল। দেখা তো গেল, কিন্তু এ সবের মূল কারণ কি?

ক্রুক্‌স্ এ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ব্যাপারটি আলোকের ন্যায় কোনোরূপ ঈথর-তরঙ্গ দ্বারা ঘটিতেছে বা পদার্থের কণিকা এইরূপ ঘটাইতেছে। দুইশত বর্ষ পূর্বে হাইগেন্‌স্ ও নিউটনের নিকট অনুরূপ সমস্যা দেখা দিয়াছিল। কল্পনা ছাড়িয়া পরীক্ষা দ্বারা ক্রুক্‌স্ সত্য নিরূপণে অগ্রসর হইলেন। ক্রুক্‌স ভাবিলেন যে, যদি উহারা কণিকা হয় তবে ভীমবেগে ধাবিত হইয়া উহারা যদি কোনও পদার্থের উপর পড়ে তাহা হইলে সেই পদার্থকে গতিমান্ করিতে পারে। ইহারা কি সেইরূপ পারে? ক্রুক্‌স্ কাচের গোলকের মধ্যে সরু লাইন পাতিলেন এবং তাহার উপর পাখনাযুক্ত একটি চাকা বসাইলেন। গোলক হইতে বায়ু বহিষ্কৃত হইতে লাগিল; এদিকে বিদ্যুৎ-মোক্ষণ আরম্ভ হইল; দেখা গেল, চাকা ধীরে ধীরে ঘুরিতে ঘুরিতে চলিল এবং নেগেটিভ (ক্যাথোড) হইতে অপরদিকে গিয়া পৌঁছিল। আলোক ঈথরতরঙ্গ, তাপও ঈথরতরঙ্গে বিকিরিত হয়, কিন্তু উহারা তো ঐরূপ ভাবে চাকা ঘুরাইতে পারে না। ইহারা

তবে কি ? ক্রুক্‌স্ ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে, চুম্বক দ্বারা ইহাদের গতিপথ বাঁকিয়া যায়। ক্রুক্‌স্ বলিলেন যে, কঠিন তরল ও গ্যাসীয় অবস্থা ব্যতীত পদার্থের একটি চতুর্থ অবস্থা আছে ; গোলকমধ্যে এই অবস্থার পদার্থ উদ্ভূত হইতেছে এবং উহাই পাত্রের কাচের গায়ে আঘাত করিয়া উহাতে সবুজ রঙের প্রতিপ্রভার (fluorescence) সৃষ্টি করিতেছে। পদার্থের চতুর্থ অবস্থার কথাটা লোকের কাছে সেরূপ স্পষ্ট হইল না কিন্তু এটা অনেকে মানিল যে, একটা নূতন কিছুর উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহাই কাচের উপর ঐ ব্যাপার ঘটাইতেছে। কাচের মধ্যস্থিত নেগেটিভ বা ক্যাথোড হইতে উদ্ভূত বলিয়া সমসাময়িক অনেক পদার্থবিৎ এই নবাবিষ্কৃত পদার্থের নাম দিলেন ক্যাথোড-রশ্মি, আর এ নাম এখনও চলিত আছে।

ক্যাথোড-রশ্মি লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে লেনার্ড দেখিলেন যে, পাত্রের অপর দিকটা কাচের না হইয়া যদি পাতলা অ্যালুমিনিয়মের হয় তবে ক্যাথোড-রশ্মি অ্যালুমিনিয়ম ভেদ করিয়া তাহাদের কারাগৃহের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি কিন্তু তখনও ঐগুলিকে ঈথরতরঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। কেম্‌ব্রিজে জে. জে. টম্‌সন এ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিলেন ; তাঁহার পরীক্ষা হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে কয়েকটি তথ্য প্রমাণিত হইল। ইহারা কণিকা ; ইহাদের ওজন আছে ; প্রত্যেকের ওজন সর্বাপেক্ষা লঘু যে হাইড্রোজেন-পরমাণু সেই হাইড্রোজেন-পরমাণুর একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র ; প্রত্যেকটি নেগেটিভ তড়িৎ-মণ্ডিত ; ভীমবেগে ইহারা ক্যাথোড হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে ; চুম্বকের দ্বারা তড়িতের দ্বারা ইহাদের গতিপথ বাঁকিয়া যায় ; বিভিন্ন পদার্থের ক্যাথোড হইতে ইহাদিগকে বাহির করা যায় ; কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যে-সকল পদার্থ হইতে ইহারা বাহির

হইতেছে তাহারা বিভিন্ন হইলেও এই কণিকাগুলি হুবহু এক। জে জে. টম্‌সনের পরীক্ষার মূল কথাগুলি ছিল এই। একটি কণিকার চলার পথের নিকটে একটি চুম্বক ধরিলে কণিকার গতিপথ কতটা বাঁকিয়া যাইবে তাহা নির্ভর করিবে চুম্বকের শক্তির উপর, কণিকার ওজনের উপর, উহাতে যে তড়িত আছে তাহার পরিমাণের উপর, উহা কি বেগে ছুটিতেছে তাহারও উপর। চুম্বকের পরিবর্তে তড়িৎ আনিলেও উহা বাঁকিয়া যায়, তবে পূর্বকার লম্ব দিকে বাঁকে এবং তাহাও আগেকার বিভিন্ন ব্যাপারের উপর বিভিন্ন রকমে নির্ভর করে। জে. জে. টম্‌সন আঁক কষিয়া এইসব হিসাব করিলেন, কণিকাগুলি কি পরিমাণে বাঁকে পরীক্ষায় নিরূপণ করিলেন; প্রতি কণিকার তড়িৎ-পরিমাণ ও ভর এই দুইয়ের ভাগফল বাহির হইল। জে. জে. টম্‌সন দেখিলেন যে, যে-পদার্থ হইতে কণিকা বাহির হোক না কেন, ঐ ভাগফল ($\frac{e}{m}$) একেবারে সমান এবং উহার পরিমাণ হইল প্রায় ১,৮০০০০০০। জলকে তড়িৎ দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া যখন হাইড্রোজেন পাওয়া যায় তখন দেখা যায় যে, হাইড্রোজেন-পরমাণুগুলি তড়িৎ-মণ্ডিত এবং প্রত্যেক হাইড্রোজেন-পরমাণুর পক্ষে ঐ ভাগফল দাঁড়ায় ১০০০০; জে. জে. টম্‌সনের পরীক্ষায় একটি কণিকার ঐ ভাগফল দাঁড়াইল ইহার প্রায় দুই হাজার গুণ। ধরা যাইতে পারে যে, একটি অ্যাটম ও একটি কণিকা, উভয়ের তড়িতের পরিমাণ সমান; তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে, একটি কণিকার ওজন একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর ওজনের প্রায় দুই হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। বিজ্ঞানী তো এক অভূতপূর্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। এতদিন তাঁহার জানা ছিল যে, পৃথিবীতে একটি হাইড্রোজেন-পরমাণু সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, ইহার অপেক্ষা ক্ষুদ্র আর-কিছু থাকিতে পারে না। কিন্তু পরীক্ষায় বাহির হইয়া আসিল এমন-কিছু যাহা একটি হাইড্রোজেন-

পরমাণুর প্রায় দুই হাজার ভাগের একভাগ, যাহা সকল পরমাণু ভাঙিয়া পাওয়া যায় এবং যে পরমাণু হইতে পাওয়া যাক না কেন যাহারা হুবহু সমান। তবে তো পরমাণুকে আর অবিভাজ্য বলা চলে না। এই সময়কার একটি কৌতুককর গল্প আছে। সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড কেল্‌ভিনের এক ছাত্র কেল্‌ভিনকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি শুনিয়াছেন অ্যাটমকে ভাঙা হইয়াছে?" কেল্‌ভিন উত্তর করিলেন, "অ্যাটমকে ভাঙা? অসম্ভব! গ্রীক ভাষায় অ্যাটম মানে হইল যাহা ভাঙা যায় না।" উদ্ধত ছাত্র বলিয়া ফেলিল, "গ্রীক জানার বিপদ ঐ।"

খ্রীস্টজন্মের ছয়শত বর্ষ পূর্বে মিলিটাসের থেল্‌স্ অ্যাম্বার (amber) ঘষিয়া একটি নূতন শক্তির উদ্ভব লক্ষ্য করেন। বহুযুগ পরে রানী এলিজাবেথের সময় ডক্টর গিলবার্ট গ্রীকভাষায় অ্যাম্বারের প্রতিশব্দ হিসাবে ঐ শক্তির নাম দিয়াছিলেন 'ইলেক্‌ট্রিসিটি'। এখন এই কণিকা যখন আবিষ্কৃত হইল তখন উক্টর জন্‌স্টন স্টোনি উহার নাম দিলেন 'ইলেকট্রন'। ১৮৯৭ সালে ২৯শে এপ্রিল জে. জে. টম্‌সন তাঁহার এই নূতন আবিক্রিয়া সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা করেন। গল্প আছে, বক্তৃতা শেষে একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তাঁহার এক অবিজ্ঞানী বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "ভায়া হে, তুমি যদি বিজ্ঞান কিছু না জান তবে তোমার অবস্থা আমার অপেক্ষা ভাল; কারণ আমার পক্ষে প্রথম দফায় যাহা জানি তাহা ভুলিতে হইবে, তাহার পর আবার নূতন করিয়া পাঠ লইতে হইবে।"

ইলেকট্রন আবিষ্কারের পর তড়িৎ সম্বন্ধে অনেক কথা নূতন ছাঁচে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইল। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। একটি দণ্ড ঘষা হইল, উহাতে পজিটিভ তড়িৎ উৎপন্ন হইল এবং যাহা দিয়া ঘষা গেল তাহাতে নেগেটিভ তড়িৎ হইল। এ ব্যাপারটি

এখন এই ভাবে দেখা হইল। দণ্ডটি ঘষিলে উহা হইতে ইলেকট্রন বাহির হইয়া যাহা দিয়া ঘষা হইলে তাহার গায়ে গিয়া পড়িল। ইলেকট্রনরা নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত হওয়ায় যাহার গায়ে গিয়া উহারা জমা হইল তাহা হইল নেগেটিভ তড়িৎ-যুক্ত, এবং যে দণ্ড হইতে উহারা চলিয়া গেল তাহা পূর্বে তড়িৎ-শূন্য থাকায় এবং নেগেটিভ তড়িৎ-যুক্ত ইলেকট্রন চলিয়া যাওয়ায় উহা পজিটিভ তড়িৎ-যুক্ত হইল।

জে. জে. টম্‌সনের পরীক্ষায় একটি ইলেক্‌ট্রনের তড়িতের পরিমাণ এবং উহার ওজন, এই দুইয়ের ভাগফল ($\frac{e}{m}$) বাহির হইয়াছিল। মিলিক্যান এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন যদ্দ্বারা একটি ইলেক্‌ট্রনের তড়িতের পরিমাণ সঠিকভাবে মাপা যায়। পরমাণু হইতে ইলেক্‌ট্রন বাহির করিবার কি উপায় আছে? গোলকমধ্যে তড়িৎস্ফুরণ দ্বারা ইহা হইতে পারে; কিন্তু দেখা গেল, নিকটে একস্‌-রশ্মি, রেডিয়ম বা তজ্জাতীয় দ্রব্য আনিলেও পদার্থ হইতে ইলেক্‌ট্রন নির্গত হইতে থাকে। মিলিক্যানের একটি পরবর্তী পরীক্ষা এইরূপ: তিনি একটি বদ্ধ কাচের পাত্রমধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৈলকণা উৎপাদন করিলেন। নিকটে একটি অণুবীক্ষণ রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া একটি কণিকাকে নিরীক্ষণ করা হইতে লাগিল; ধীরে ধীরে উহা নামিতে থাকিল। গোলকমধ্যে উপরের দিকে একটি ধাতব পাত্র ছিল; এখন উহাকে এইরূপ শক্তির তড়িৎ দেওয়া হইল যাহাতে কণিকাটি আর নামে না, ধীর-স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এইবার পাত্রের বাহিরে এক্‌স্‌-রশ্মি-সম্পাতে ভিতরে ইলেকট্রনের সৃষ্টি হইল। যেই একটি ইলেক্‌ট্রন ঐ তৈলকণার গায়ে আসিয়া তাহার নেগেটিভ তড়িৎ দিয়া দিল অমনি তৈলকণাটি আর স্থির থাকিল না, নড়িতে লাগিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ উপরের ধাতব পাত্রে তড়িতের পরিমাণ পরিবর্তন করা হইল যাহাতে তৈলকণাটির নড়াচড়া

বন্ধ হয়, উহা আবার স্থির হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য ধাতব পদার্থে কতটা পরিমাণ তড়িতের পরিবর্তন করিতে হইল লক্ষ্য করিয়া ইলেক্ট্রনে নিবদ্ধ তড়িতের পরিমাণ মাপা হইল। পূর্বে জে. জে. টম্‌সনের পরীক্ষা হইতে ইলেক্ট্রনে তড়িতের পরিমাণ ও উহার ভর এই দুইয়ের ভাগফল বাহির হইয়াছিল; মিলিক্যানের পরীক্ষায় তড়িতের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইল; সুতরাং একটি ইলেক্ট্রনের ভর সঠিকভাবে বাহির হইয়া গেল। জে. জে. টম্‌সন ও মিলিক্যানের পরীক্ষার কৌশল উন্নতি লাভ করিল, অন্য উপায়েও ঐসব সংখ্যা নির্ধারিত হইল; শেষ অবধি বিজ্ঞানী সঠিকভাবে জানিল যে, একটি ইলেক্ট্রনের ওজন একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর ওজনের ১৮৪৬ ভাগের একভাগ মাত্র। আরও দাঁড়াইল, একটি ইলেক্ট্রনে যে পরিমাণ তড়িৎ আছে তদপেক্ষা স্বল্প পরিমাণের তড়িৎ কোথাও থাকিতে পারে না এবং যেখানে যেরূপ ভাবে তড়িৎ উৎপাদিত হোক সর্বত্র তাহা এই মাত্রা তড়িতের গুণিতক। জে. জে. টম্‌সমনের পরীক্ষা হইতে গোলকমধ্যে ইলেক্ট্রনের বেগ বাহির হইল। কি প্রচণ্ড এই বেগ! সেকেণ্ডে বহু হাজার মাইল হিসাবে। গোলকে বায়ুর অভাব যত হয় এবং তড়িৎ-বিভব (potential) যত বেশী হয় এই বেগ তত বাড়ে। আলোকের বেগ সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। কাচের গোলকের মধ্যে ইলেক্ট্রনের বেগ প্রায় তাহার দশ ভাগের একভাগ অবধি গিয়া দাঁড়াইল।

এখন কথা হইল যে, একটি পরমাণু যখন তড়িৎ-শূন্য এবং পরমাণুর মধ্যে বাস করে ইলেক্ট্রন যাহা নেগেটিভ তড়িৎ-যুক্ত তখন পরমাণুর অপর একটি অংশ থাকা চাই যাহা পজিটিভ-তড়িৎ-মণ্ডিত। অবশ্য এ অংশ আছে এবং প্রতি পরমাণুতেই আছে। প্রতি পরমাণু পজিটিভ ও নেগেটিভ তড়িতের সমষ্টিমাত্র। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা

যাইতেছে। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে স্থিরবিদ্যুৎ পড়ানো হইতেছিল। একটি ছাত্রকে কাচের পায়াযুক্ত টুলের উপর দাঁড় করাইয়া তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র হইতে তাহার দেহে তড়িৎ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। কয়েকরকম পরীক্ষার পর ছাত্রটিকে নামিয়া যাইতে বলা হইল। ছাত্রটি যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিল তাহার দেহে তখনও তড়িৎ আছে কি না? তখন তাহাকে এ কথা বলা চলিল না যে, তাহার দেহটি সকল সময়েই পজিটিভ ও নেগেটিভ তড়িতের সমষ্টিমাত্র। আর শুধু তাহার দেহ নয়—তাহার, তাহার সহপাঠিগণের, তাহার শিক্ষকের, সকলের দেহ—সেই ঘরের টেবিল বেঞ্চ ইট কাঠ, বাহিরের গাছপালা, দূরের অট্টালিকা, যাহা কিছু সে দেখিতেছে, জগতের সকল পদার্থের মধ্যে আছে পজিটিভ ও নেগেটিভ তড়িৎ। একথা তখন তাহাকে বলিতে যাইলে সে মনে করিত, পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাসে শিক্ষকমহাশয় বোধ হয় কোনও দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন।

এখন, পরমাণুর মধ্যে পজিটিভ তড়িৎ কোথায় কি ভাবে বিদ্যমান? জে. জে. টম্‌সন কল্পনা করিলেন যে, পরমাণুর সমস্ত অবয়ব ব্যাপিয়া পজিটিভ তড়িৎ আছে এবং তাহার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ইলেক্‌ট্রনগুলি বিদ্যমান, ঠিক যেমন কেকের মধ্যে কিশমিশ অবস্থিত। জে জে. টম্‌সনের এ কল্পনা কিন্তু শীঘ্রই পরিত্যক্ত হইল। পরিত্যক্ত তো হইল, কিন্তু দাঁড়াইল কি? সে আলোচনার পূর্বে অন্যান্য কয়েকটি বিষয় স্মরণ করিতে হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে এক নবযুগ আরম্ভ হয়। সেইসময় ইলেক্‌ট্রনের পরিচয় মিলিল, সেইসময় রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কৃত হইল, সেইসময় বিনা তারে বার্তা প্রেরিত হইল, সেইসময় নবাবিষ্কৃত রেডিয়মের গুণাবলি বিজ্ঞানীর বহুদিন-পোষিত চিন্তার ধারাকে আলোড়িত করিল।

রঞ্জনরশ্মি সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষা হইতে প্রমাণিত হইল যে, রঞ্জনরশ্মির প্রকৃতি আলোকরশ্মির অনুরূপ, উভয়েই ঈথর-তরঙ্গ, তবে রঞ্জনরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক ছোট। দৃশ্যমান আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সব সমান নয়; লাল আলোকের একরকম, পীত আলোকের আর-একরম, বেগুনি আলোকের ভিন্নরকম। রঞ্জনরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য কি সমান? মোস্‌লে এ সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। বাল্‌বের মধ্যে যে ধাতব পদার্থের উপর ইলেক্‌ট্রন আঘাত করিয়া রঞ্জনরশ্মি—এক্‌স্‌-রশ্মি—উৎপাদন করে, মোস্‌লে এক এক করিয়া তাহা পরিবর্তন করিতে লাগিলেন। প্রতিবারে যে এক্‌স্‌-রশ্মি বাহির হইল তাহার দৈর্ঘ্য মাপিলেন। পরীক্ষার ফলাফল হইতে মোস্‌লে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা বিজ্ঞানীর চিন্তাধারাকে এক নূতন রূপ দিল। এই তরুণ বিজ্ঞানী ১৯১৪ সালের ইয়ুরোপীয় মহাসমরে তাঁহার দেশের পক্ষ হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হন এবং ডার্ডেনেলিসে শত্রুর গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি যে উচ্চধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন তাহা তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে।

মোস্‌লের গবেষণার মূল কথাগুলি এই: মৌলিক পদার্থগুলিকে আণবিক ওজন অনুসারে সাজানো হইল। অক্সিজেনের আণবিক ওজন ১৬, এই অনুপাতে হাইড্রোজনের আণবিক ওজন ১·০০৮, হিলিয়মের ৪, লিথিয়মের ৬·৯৪, বেরিলিয়মের ৯·১, এইরকম বরাবর গিয়া ইয়ুরেনিয়মের আণবিক ওজন ২৩৮·২। দেখা যাইতেছে যে, পর পর মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে আণবিক ওজনের ব্যবধানের কোনও স্থিরতা নাই; ব্যবধান কোথাও কোথাও একেরও কম, কোথাও চারেরও বেশী। মোস্‌লে মৌলিক পদার্থগুলিকে আণবিক ওজন অনুসারে সাজাইলেন,

সাজাইয়া তাহাদিগকে ক্রমিক সংখ্যা দিলেন। হাইড্রোজেনের সংখ্যা হইল ১, হিলিয়ম ২, লিথিয়ম ৩, বেরিলিয়ম ৪, বরাবর যাইয়া সোনার সংখ্যা দাঁড়াইল ৭৯, পারদ ৮০, অনাবিষ্কৃতদের জন্য স্থান ছাড়িয়া রাখিয়া ইয়ুরেনিয়মের সংখ্যা পড়িল ৯২। একে একে ইহাদের অনেকগুলিকে এক্‌স্‌-রশ্মির বাল্‌বের মধ্যে দিয়া এবং ইহাদের প্রত্যেকের সহিত সংঘাতে উত্থিত এক্‌স্‌-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য মাপিয়া মোস্‌লে এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। পর পর আণবিক ওজনের ব্যবধান সমান নয়, কিন্তু ইহাদিগের হইতে উত্থিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে এক শৃঙ্খলা আছে। কেন এমন হইল? কল্পনা করা হইল যে, আণবিক গুরুত্ব অনুসারে সাজানো পরমাণুর অভ্যন্তরে এমন-কিছু আছে যাহা ধাপে ধাপে সর্বত্র সমানভাবে বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু, কি সে যাহা সমান হারে বাড়িয়া চলিতেছে? অভ্যন্তরস্থ তড়িৎ কি? যাহাই হোক, এটা ঠিকভাবে জানা গেল যে, একটা মৌলিক পদার্থের পরিচয় দিতে হইলে আণবিক ওজনের পরিবর্তে আণবিক সংখ্যা হইবে উহার যথাযথ পরিচায়ক।

মোস্‌লে যখন এই-সব পরীক্ষা করিতেছিলেন তাহার অল্প কিছু পূর্ব হইতে রাদারফোর্ড একটি পরমাণুর পূর্ণচিত্র উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত ছিলেন। পূর্বকথাগুলি আর-একবার স্মরণ করা যাক। পরমাণু হইতে ইলেক্‌ট্রন বাহির হইল। ইলেক্‌ট্রন নেগেটিভ-তড়িৎ-যুক্ত, কিন্তু সমস্ত পরমাণুটি তড়িৎ-শূন্য। তাহা হইলে পরমাণুর একটি অংশ নিশ্চয়ই আছে যাহা পজিটিভ তড়িৎ-যুক্ত এবং সেই পজিটিভ তড়িতের পরিমাণ ইলেক্‌ট্রনের নেগেটিভ তড়িতের সমান। পরমাণুর মধ্যে কোথায় এই পজিটিভ-তড়িৎ আছে? জে. জে. টম্‌সন কল্পনা করিলেন যে, সমস্ত পরমাণুটি ব্যাপ্ত হইয়া পজিটিভ তড়িৎ আছে, মধ্যে মধ্যে ইলেক্‌ট্রনগুলি ছড়াইয়া আছে। ইহার মূলে কোনো পরীক্ষালব্ধ সত্য নাই। সঠিক

সংবাদ পাইতে হইলে পরমাণুর অভ্যন্তরে কাহাকেও পাঠাইতে হইবে এবং আকারে উহা পরমাণুর অপেক্ষা বড় হইলে চলিবে না। সে যেন ফিরিয়া আসে, ভিতরের সংবাদ বহন করিয়া আনে; তজ্জন্য তাহাকে প্রভূত শক্তিমান হইতে হইবে, ভিতরে আটক পড়িয়া না যায়। যে ছট্‌রা পাঠানো হইবে তাহা পরমাণুর মত ক্ষুদ্র হইবে, অথচ প্রচণ্ড বলশালী হইবে।

রাদারফোর্ড্ দেখিলেন, এইরূপ ছট্‌রা তো প্রকৃতির রাজ্যেই রহিয়াছে। রেডিয়ম বা ঐজাতীয় তেজস্ক্রিয় (radio-active) পদার্থ হইতে যে আল্‌ফা-রশ্মি নির্গত হয় তাহার প্রকৃতি এইরূপ। একটি আল্‌ফা-রশ্মি হইল পজিটিভ তড়িৎযুক্ত একটি হিলিয়ম পরমাণু, ইলেক্‌ট্রনে যে পরিমাণ তড়িৎ থাকে ইহাতে তড়িতের পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ। তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে যখন বাহির হয় তখন ইহার বেগ সেকেণ্ডে ২০ হাজার মাইল বা ঐ ধরনের। একটি আল্‌ফা-রশ্মি যখন পরমাণুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার বাহির হইয়া আসিবে তখন উহার গতিপথ দেখিয়া ভিতরের অনেক সংবাদ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। পরমাণু হইতে বাহির হইয়া উহা যদি জিঙ্ক্-সলফাইড পর্দার উপরে পড়ে স্থানটি হইতে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইবে; যদি সি. টি. আর. উইলসনের কক্ষমধ্যে পরিপৃক্ত জলীয় বাষ্পের ভিতর দিয়া যায় তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা দ্বারা উহার গতিপথ অঙ্কিত করিবে। এইরূপ কক্ষস্থিত গ্যাসের মধ্যে আল্‌ফা-রশ্মি পাঠাইয়া এবং বিবিধ ফটোগ্রাফ লইয়া রাদারফোর্ড্ দেখিলেন যে আল্‌ফা-রশ্মির পথ সোজা গিয়া মাঝে মাঝে হঠাৎ একেবারে বাঁকিয়া গিয়াছে।

এই সব দেখিয়া রাদারফোর্ড্ একটি পরমাণুর আভ্যন্তরিক চিত্র এইরূপ আঁকিলেন। পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে পজিটিভ তড়িৎ অবস্থিত; পদার্থের প্রায় সমস্ত ভর সেইখানেই সংহত হইয়াছে; এই ভর অতি

অল্পপরিসর স্থানে সীমাবদ্ধ; ইলেক্‌ট্রন অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত; ইহাদের মধ্যের স্থান শূন্য। এইরূপ গঠনের পরমাণুর মধ্যে আল্‌ফা-রশ্মি প্রবেশ করিল। এখন পরমাণুর কেন্দ্রে আছে পজিটিভ-তড়িৎ, আল্‌ফা-রশ্মিও পজিটিভ-তড়িৎ-যুক্ত; উভয়ে যদি খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়ে তবে উহাদের মধ্যে প্রবল বিকর্ষণ হইবে, ফলে আল্‌ফা-রশ্মির পথ বাঁকিয়া যাইবে। আল্‌ফা-রশ্মির ভর, উহার তড়িৎ-পরিমাণ, জানা আছে। মনে করা যাক, উহা একটি সোনার পরমাণুর নিকট দিয়া যাইতেছে। এই পরমাণুরও ভর জানা আছে; ইহার অভ্যন্তরস্থ তড়িতের একটা পরিমাণ যদি ধরিয়া লওয়া যায় তবে আল্‌ফা-রশ্মি উহার কতটা নিকট দিয়া যাইলে উহা কতটা পরিমাণে বাঁকিবে রাদার-ফোর্ড আঁক কষিয়া ঠিক করিলেন। রাদারফোর্ড্, গাইগার এবং মার্স্‌ডেন ও স্যাড্‌উইক পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল যে, একটি সোনার পরমাণুর আভ্যন্তরিক তড়িতের পরিমাণ একটি ইলেকট্রনের তড়িতের পরিমাণের ৭৯ গুণ। স্মরণ রাখিতে হইবে, সোনার আণবিক সংখ্যা হইল ঐ ৭৯। অন্যান্য পদার্থ লইয়াও পরীক্ষা হইল; সাধারণ ভাবে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইল যে, প্রতি পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ তড়িতের পরিমাণ উহার আণবিক সংখ্যার উপর নির্ভর করিতেছে। এই-সব পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয়ে অঙ্কশাস্ত্রের একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইল। একটিমাত্র পরমাণু লইয়া পরীক্ষা করা যায় না; এতটুকু পদার্থ লইলেও তাহার মধ্যে অসংখ্য পরমাণু থাকে, অতএব হিসাবের মধ্যে গড় হিসাব প্রয়োগ করা হইল।

পরীক্ষা হইতে একটি পরমাণুর গঠন যেরূপ দাঁড়াইল তাহা আর-একবার দেখা যাক। একটি পরমাণুর ভরের প্রায় সবটাই কেন্দ্রে খুব অল্পপরিসর স্থানে সংবদ্ধ। সমস্ত পরমাণুটি পজিটিভ ও নেগেটিভ

তড়িৎ-যুক্ত পদার্থের সমষ্টি ; নেগেটিভ তড়িৎ-যুক্ত ইলেকট্রনরা চারিদিকে ছড়াইয়া আছে, আর সমস্ত পজিটিভ তড়িৎ কেন্দ্রস্থিত ভরে আবদ্ধ। পরমাণুর আণবিক সংখ্যা যত বাহিরের ইলেকট্রনের সংখ্যা তত ; আর বাহিরে বিক্ষিপ্ত সমস্ত ইলেক্‌ট্রনে যতটা নেগেটিভ তড়িৎ কেন্দ্রস্থ পজিটিভ তড়িৎ সেই পরিমাণের।

এই হিসাবে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠন কিরূপ দাঁড়ায় এইবার দেখা যাক। সর্বাপেক্ষা হালকা হাইড্রোজেন-পরমাণুর গঠন সর্বাপেক্ষা সরল ধরা হইল। এই পরমাণুর বাহিরে আছে একটিমাত্র ইলেক্‌ট্রন। সমস্ত হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর ধরা হইয়াছে ১·০০৮১, এই অনুপাতে ইলেক্‌ট্রনের ভর হইল ·০০০৫৪৮৬, আর, হাইড্রোজেনের অবশিষ্ট অংশ, অর্থাৎ প্রায় সবটাই, কেন্দ্রে অবস্থিত ; ইহার ভর দাঁড়াইল ১·০০৭৫৮ ; এখানে আছে পজিটিভ তড়িৎ ; উহার পরিমাণ ইলেক্‌ট্রনের তড়িতের সমান। ১৯২০ সালে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরিক অধিবেশনে রাদারফোর্ড্ ইহার নাম দিলেন প্রোটন। সুতরাং কল্পনায় দাঁড়াইল যে, একটি হাইড্রোজেন-পরমাণু একটি প্রোটন ও একটি ইলেক্‌ট্রনের সমষ্টিমাত্র, আর-কিছু ইহাতে নাই। অপেক্ষাকৃত ভারী পরমাণুতে ইলেক্‌ট্রনের ও প্রোটনের সংখ্যা বাড়িয়া চলে, এই মাত্র। বিভিন্ন পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন অট্টালিকা প্রোটন-রূপ ইট ও ইলেক্‌ট্রন-রূপ মসলা দ্বারা গ্রথিত। এই-সব অট্টালিকার রূপ ও প্রকৃতি বিভিন্ন, কারণ, ইটের সংখ্যা ও মসলার পরিমাণ এবং গাঁথিবার কৌশল বিভিন্ন। কিন্তু বিভিন্ন পরমাণুর মূল উপাদান হইল ঐ একই রকমের ইলেকট্রন এবং একই রকমের প্রোটন। রাদারফোর্ড্ পরমাণুর এইরূপ পরিকল্পনা করিলেন, তবে নিউট্রন আবিষ্কারের পর তাঁহার পরিকল্পনাকে পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হইল।

বিশ্বের মূল উপাদান হইল ৯২ রকমের বিভিন্ন পরমাণু, বিজ্ঞানীর এ ধারণা এখন ধূলিসাৎ হইল। এখন দাঁড়াইল এই যে, আমাদের দৃষ্টির গোচর এবং অগোচর সকল বস্তুর মূলে, এই পৃথিবীর মূলে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মূলে আছে মাত্র দুইটি বস্তু—এক নেগেটিভ তড়িৎ-যুক্ত ইলেকট্রন এবং আর-এক পজিটিভ তড়িৎ-যুক্ত প্রোটন, মাত্র এই দুইটি, আর-কিছু নয়।

পজিট্রন, নিউট্রন, নিউট্রিনো, মিসোট্রন

বিজ্ঞানীর পরীক্ষা চলিতে লাগিল। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল হিসাবে শেষ অবধি এমন-সব বস্তু আসিতে লাগিল যাহাদের কথা পূর্বে কল্পনাতেও আনিতে পারা যায় নাই কিন্তু যাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ রহিল না এবং যাহাদিগকে বিশ্বের মূল উপাদান বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়।

পজিট্রন

১৯৩০ সালে ডিরাক ইলেকট্রন ও প্রোটনের সম্বন্ধ বিষয়ে একটি বিচার প্রকাশিত করেন। ইলেকট্রনের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া এবং কোয়ান্টম-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলবিদ্যার (mechanics) নিয়ম প্রয়োগ করিয়া ডিরাক প্রোটনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গণনা করিলেন। এই গণনায় এক অদ্ভুত ফল দেখা দিল; গণনায় একদল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ আসিল। যাহারা ইলেকট্রনেরই মত কিন্তু যাহাদের তড়িৎ নেগেটিভ নয়, পজিটিভ। ইহাদিগকে কল্পনায় আনিবার জন্য ডিরাক যে চিত্র

দিলেন তাহা একদিকে যেমন উজ্জ্বল, অপর দিকে তেমনি দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক। এ চিত্র উপলব্ধি করিবার জন্য একটি উপমার কথা চিন্তা করা যাইতে পারে।

একটি রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহের কথা কল্পনা করা যাক। অচিরে অভিনয় আরম্ভ হইবে; দর্শকগণ তাহাদের আসনে উপবিষ্ট। দু-একজন বিলম্বে-আগত দর্শক শূন্য আসন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, খালি আসন পাইলেই বসিয়া পড়িবে। ডিরাকের মতে, প্রেক্ষাগৃহের খালি আসনের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডের স্থানে স্থানে গর্ত আছে; এক-একটি গর্ত এক-একটি ইলেকট্রনের জন্য নির্দিষ্ট, ঠিক যেমন প্রেক্ষাগৃহের খালি আসন বিলম্বে আগত দর্শকের জন্য নির্দিষ্ট। প্রেক্ষাগৃহের শূন্য আসনের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, পূর্ণ আসনের সংখ্যা অনেক বেশী। ব্রহ্মাণ্ডেও অধিকাংশ ইলেকট্রন তাহাদের স্থান দখল করিয়াছে; ভবিষ্যতে শূন্যস্থানও পূর্ণ হইবে। প্রেক্ষাগৃহের যে-সব দর্শক আসন গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহারা আসন অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য অনেক। সেইরূপ যে-সব ইলেকট্রন গর্তে আছে এবং যাহারা নাই তাহাদের মধ্যেও গুরুতর পার্থক্য। যাহারা গর্তের মধ্যে আছে তাহারা আমাদের নিকট একেবারে লুপ্ত; আমাদের কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। বাহিরে যে ইলেকট্রনের সহিত আমাদের পরিচয় তাহারা এখনও শূন্য স্থান অধিকার করে নাই। এক-একটি শূন্য স্থান হইল এক-একটি পজিটিভ ইলেকট্রন। একটি ইলেকট্রন যখন একটি শূন্য স্থান দখল করিবে, অর্থাৎ যখন পজিটিভ ইলেকট্রনকে নেগেটিভ ইলেকট্রন আলিঙ্গন করিবে তখনই উহাদের ধ্বংস। ধ্বংসের ফলে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মি উৎপন্ন হইবে এবং উহা এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিচরণ করিবে।

যে-সব গর্ত খালি তাহারা পজিটিভ তড়িৎ-যুক্ত অথচ তাহারা প্রোটন নয়; পরবর্তী হিসাবে ডিরাক দেখিলেন যে, তাহাদের ভর ইলেক্ট্রনের ভরের সমান, প্রোটন হইলে ভর ইলেক্ট্রনের ১৮৪৬ গুণ হইত। ডিরাকের কল্পনা যেন স্বপ্নরাজ্য হইতে আনীত; ইহা একটি প্রদীপ্ত শিখা, কিন্তু দেখা গেল ভিতরে অগ্নিও আছে।

ডিরাকের হিসাব হইতে আর একটি কথা আসিল। একটি পজিটিভ ইলেকট্রনের জীবন অতি অল্পক্ষণস্থায়ী, এক সেকেণ্ডের প্রায় একশত কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান যদি এইটুকুমাত্র সময় হয় তবে কিরূপে ইহা নিজেকে প্রকাশিত করিবে? কিন্তু ইহা তো প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হয়; এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেও ইহা প্রায় এক গজ পথ অতিক্রম করে। তবে তো সি. টি. আর. উইলসনের কক্ষে ইহা আপনার গতিপথ অঙ্কিত করিবে। ইহার পূর্ব হইতে কস্‌মিক রশ্মি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল। এই রশ্মি পৃথিবীর সর্বত্রই পাওয়া যায়; সমুদ্রতটে, পর্বতশিখরে, গভীর হ্রদের মধ্যে, উপরে যতদূর অবধি উঠা যায়, পৃথিবীর সর্বত্র এই রশ্মি বিদ্যমান। এই কস্‌মিক রশ্মি-জনিত যে কণিকা পাওয়া যায়, দেখা যায়, তাহার শক্তি অসাধারণ। অত্যন্ত দ্রুত আল্‌ফা-রশ্মির শক্তি ৪০ লক্ষ ইলেক্ট্রন-ভোল্ট্, এই কণিকার শক্তি প্রায় ১০০ কোটি ইলেক্ট্রন-ভোল্ট। শক্তি এত বেশী হওয়ায় যে-চুম্বক দ্বারা ইহার গতিপথ বাঁকিয়া যাইবে তাহাকে প্রচণ্ড শক্তিশালী হইতে হইবে। সহস্রাধিক অ্যাম্পিয়ারের তড়িৎ-স্রোত পাঠাইয়া চুম্বক প্রস্তুত হইল এবং উহা দ্বারা ঐ-সব কণিকার গতিপথ কিরূপ বাঁকে সি. টি. আর. উইলসনের কক্ষে তাহার চিত্র লওয়া হইতে লাগিল। এইরূপ এক যন্ত্রে ১৯৩২ সালে ২রা আগস্ট অ্যাণ্ডার্সন একটি ফটোগ্রাফে যে-রেখা দেখিলেন তাহা নিঃসংশয়রূপে এক নূতন পদার্থের

অস্তিত্ব প্রকাশিত করিল। ইলেক্‌ট্রনের মতই উহা ভারী, তড়িৎ-পরিমাণ ইলেক্‌ট্রনেরই মত, তবে সে তড়িৎ নেগেটিভ নয়, পজিটিভ।

ইহার নাম দেওয়া হইল পজিট্রন।

প্রকৃতিতে যখন এই ক্ষণজীবী নূতন পদার্থের সন্ধান মিলিল তখন অনুসন্ধান চলিল কৃত্রিম উপায়ে ইহা সৃষ্ট হইতে পারে কি না। ১৯৩৪ সালে ম্যাডাম কুরীর কন্যা ইরিন ও তাঁহার স্বামী জোলিও দেখিলেন যে, পলোনিয়ম হইতে নির্গত আল্‌ফারশ্মি যখন বোরন, ম্যাগনিসিয়ম বা অ্যালুমিনিয়মের উপর পড়ে তখন উহারা অস্থায়ীভাবে তেজস্ক্রিয় হয় এবং উহা হইতে পজিট্রন নির্গত হয়। ইহার পর বহু তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হইতে লাগিল যাহা হইতে পজিট্রনের নির্গম লক্ষিত হইল।

যদিও এই পৃথিবীতে পজিট্রন দুর্লভ ও ক্ষণস্থায়ী তথাপি নানা পর্যবেক্ষণ হইতে এই কথাটা জানা গেল যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া বহুল পরিমাণে পজিট্রন বিরাজ করিতেছে এবং বিশ্বের উপাদান হিসাবে ইহা মোটেই নগণ্য নয়।

নিউট্রন ও নিউট্রিনো

১৯৩২ সালের প্রথম ভাগে স্যাড্‌উইক বলিলেন যে, পরীক্ষায় তিনি এমন একটি পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন যাহার প্রোটনের মতই ভর আছে কিন্তু যাহা আদৌ তড়িৎ-যুক্ত নয়। ইহার নাম দেওয়া হইল নিউট্রন। অবিলম্বে বিভিন্ন পরীক্ষাগারে ইহার অনুসন্ধান চলিল এবং স্যাড্‌উইকের কথা সমর্থিত হইল। যে ঘটনাবলী অনুসরণ করিয়া ইহা আবিষ্কৃত হয় তাহা এই।

১৯৩০ সালে বোটে এবং বেকার পলোনিয়ম হইতে নির্গত আল্‌ফা-রশ্মি লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিলেন যে, উহারা যদি বেরিলিয়ম

বা বোরনের উপর পতিত হয় তবে ঐ বেরিলিয়ম বা বোরন হইতে একপ্রকার রশ্মি নির্গত হয় যাহার পদার্থ ভেদ করিবার ক্ষমতা অসাধারণ। রেডিয়ম ও তজ্জাতীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে উত্থিত গামা-রশ্মির এইরূপ ক্ষমতা থাকায় তখন উহা গামা-রশ্মি বলিয়া বিবেচিত হইল। কুরী জোলিও ও ওয়েবস্টার দেখিলেন যে, এই নূতন রশ্মির পদার্থের মধ্য দিয়া যাইবার ক্ষমতা গামা-রশ্মি অপেক্ষা অনেক বেশী। পরে কুরী জোলিও ও জোলিও লক্ষ্য করিলেন যে, এই রশ্মি যদি হাইড্রেজেন-যুক্ত কোনও পদার্থের উপর পড়ে তবে সেই পদার্থ হইতে প্রচণ্ডবেগে প্রোটন নির্গত হয়। বহু আলোচনার পর, স্থির হইল যে, ইহা একটি নূতন পদার্থ এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও কল্পনা করিতে হইল যে, ইহা তড়িৎ-শূন্য। ঠিক করা হইল যে, একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের সমাবেশে একটি নিউট্রন গঠিত। কিন্তু, একটি হাইড্রোজেন-পরমাণু তো এইরূপই। ঠিক বটে, তবে পার্থক্য এই হইল যে, নিউট্রনে প্রোটন ও ইলেক্ট্রন খুব বেশী নিকটবর্তী হইয়া আছে; হাইড্রোজেন-পরমাণুতে উহাদের মধ্যে যে-ব্যবধান এখানে ব্যবধান তাহার লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র। একটি পরমাণুর আকারের অনুপাতে নিউট্রন এত ক্ষুদ্র হওয়ায় ইহা স্বচ্ছন্দে সছিদ্র পরমাণুর মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে পারে; আর তড়িৎ শূন্য হওয়ায় ইহার গতিপথের উপর বাহিরের ইলেক্ট্রনের কোনও ক্রিয়া থাকে না। যেখানে একটি নির্দিষ্ট বেগের প্রোটন বায়ুর মধ্যে চলিয়া মাত্র এক ফুট যাইয়া থামিয়া পড়িবে, এই নিউট্রন সেখানে কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তবে তাহার শক্তি হারাইবে।

এইবার নিউট্রনের ভর বাহির করিবার জন্য বিবিধ পরীক্ষা হইল। নানা পরীক্ষা হইতে শেষ অবধি এই দাঁড়াইল যে, ইহার ভর প্রায় ১·০০৮৯৩৭ যেখানে হাইড্রোজেনের, ১·০০৮১৩। কিন্তু হাইড্রোজেন-

পরমাণু তো একজোড় প্রোটন-ইলেক্‌ট্রনের সমষ্টি। নিউট্রনও তাহাই। নিউট্রনে যে ভর কমিয়া গেল তাহার কারণ এই যে, নিউট্রন গঠনের সময় কিছুপরিমাণ ভরের হ্রাস হইয়াছিল এবং সেই কারণে ইহাদের বন্ধন খুব দৃঢ় হইয়া আছে। নিউট্রন তড়িৎ-শূন্য হওয়ায় উইলসন-কক্ষে জলবিন্দু উৎপন্ন করে না, কোনও চিত্র পাওয়া যায় না। ইহা যখন একটি অণুকে আঘাত করে তখন সেই অণু ধাক্কা খাইয়া পিছু হঠে এবং তাহা হইতে পরোক্ষভাবে আঘাতকারী নিউট্রনের অস্তিত্ব নির্ণীত হয়।

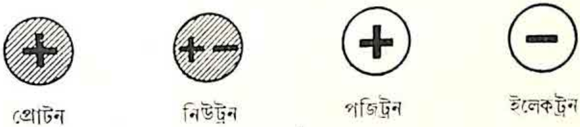
পূর্বে মনে করা হইত, পরমাণুর কেন্দ্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন আছে। এখন ধরা হইল, কেন্দ্রে ইলেক্‌ট্রন থাকে না, থাকে নিউট্রন ও প্রোটন। হাইড্রোজেনের কেন্দ্রকে (nucleus) মাত্র একটি প্রোটন আছে, লিথিয়ম কেন্দ্রকে দুটি প্রোটন দুটি নিউট্রন—এইরূপ বরাবর চলিয়া গিয়াছে।

এই সময় বিটা-রশ্মি লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে কতকগুলি ঘটনা দেখা গেল যাহা কোনও রকমে মীমাংসিত হয় না। এজন্য কোনও কোনও বিজ্ঞানী আর-একটি মূল পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিলেন এবং তাহার নাম দিলেন নিউট্রিনো। চিন্তা করা হইল যে, এই নিউট্রিনো তড়িৎ-শূন্য এবং ইহার ভর নাই বলিলেই হয়।

মিসোট্রন (মেসন)

সম্প্রতি আর-একটি মূল পদার্থ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। পজিট্রনের ন্যায় ইহার প্রথম আবির্ভাব বিজ্ঞানীর কল্পনালোকে, খাতায় কলমে। গণনাটা এইরূপে দাঁড়াইল।

নিউট্রন আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীকে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে তাঁহার পূর্বধারণা পরিবর্তন করিতে হইল। অনেকরকম পরীক্ষা হইতে দেখা



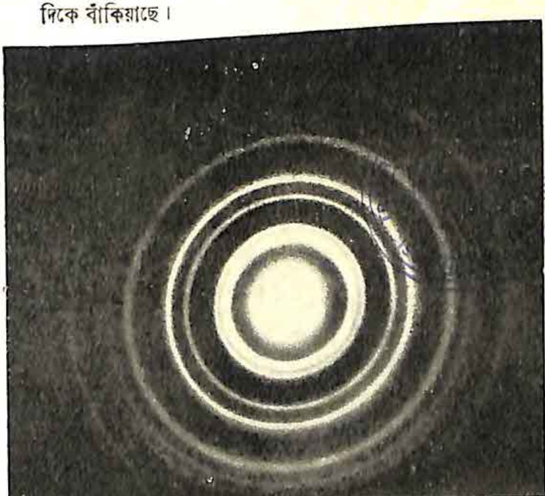
চারিটি প্রধান উপাদান।



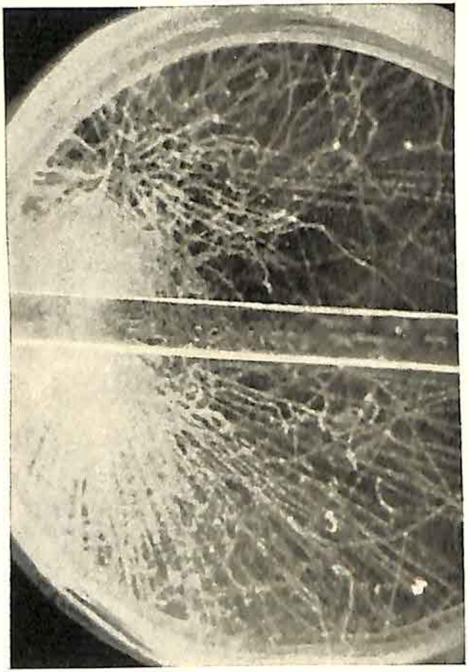
ইলেকট্রন ও পজিটনের সৃষ্টি হইয়াছে ; ইলেকট্রন এক-দিকে এবং পজিট্রন বিপরীত দিকে বাঁকিয়াছে।



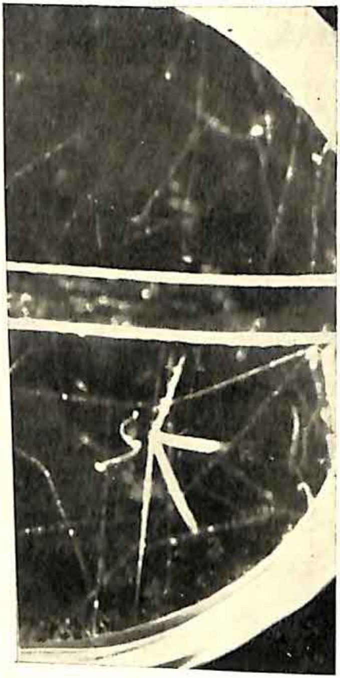
নিউট্রন অক্সিজেন-অ্যাটমকে ভাঙিয়াছে। ডানদিকের লম্বা রেখা সম্ভবত হিলিয়ম-অ্যাটমের জন্য এবং বামদিকের ছোট রেখাটি কার্বন-অ্যাটমের গতিরেখা।



জি. পি. টমসনের পরীক্ষায় দেখা যাইতেছে যে ইলেকট্রন তরঙ্গের মত রেখাচিত্র অঙ্কিত করিতেছে।



একটি কসমিক-রশ্মিকণা হইতে প্রায় দুই শত নূতন কণার সৃষ্টি ; ইহারা ইলেকট্রন ও মিসট্রোন।



কসমিক-রশ্মি-নিউট্রনের আঘাতে একটি কেন্দ্রক চার টুকরা হইয়াছে।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের পরীক্ষায় প্রাপ্ত চিত্র

যায় যে, পরমাণুর কেন্দ্রকেরও (nucleus) আবর্তন আছে। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফলের সহিত খাপ খায় না যদি ধরা হয় যে কেন্দ্রে ইলেকট্রন আছে। কেন্দ্রক—ইলেকট্রন ও প্রোটনের পরিবর্তে নিউট্রন ও প্রোটন দিয়া গঠিত যদি এইরূপ কল্পনা করা হয় তবে সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়। সেইরূপ কল্পনাই হইল। এখন কথা হইল, সেখানে উহাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছে কে? বাঁধন খুবই শক্ত, নচেৎ তাহারা আপনা হইতেই দলভ্রষ্ট হইত, পরমাণুটি রূপান্তরিত হইয়া যাইত। দুইটি হাইড্রোজেন-পরমাণু যুক্ত হইয়া একটি হাইড্রোজেন-অণুতে দাঁড়ায়; হাইসেন্‌বার্গ প্রথমে বলিলেন যে, ঐ-পরমাণু-দুইটির মধ্যে শক্তির আদান প্রদান চলিতেছে এবং ঐ শক্তিই পরমাণু-দুইটিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। পরমাণুর কেন্দ্রক সম্বন্ধে সেইরূপ কল্পনা করা হইল; মনে করা হইল, উহার বিভিন্ন অংশের মধ্যে শক্তির আদানপ্রদান চলিতেছে এবং ঐ শক্তিই কেন্দ্রককে অটুট রাখিয়াছে। কল্পনা করা হইল যে, কেন্দ্রস্থিত নিউট্রন হইতে ইলেকট্রন ও নিউট্রিনো বাহির হইতেছে, প্রোটন তাহা গ্রহণ করিতেছে; এইরূপ প্রক্রিয়ার ফলে শক্তির যে আদানপ্রদান চলিতেছে তাহাই কেন্দ্রককে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এইরূপ পরিকল্পনায় এক বাধা আসিল। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে শক্তির এই আদানপ্রদানে ইলেকট্রন অংশ গ্রহণ করিতেছে তবে হিসাবে দেখা যায় যে, তজ্জনিত যে শক্তি হইবে তাহা কেন্দ্রককে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। ১৯৩৫ সালে জাপানী বিজ্ঞানী ইউকাওয়া ধরিয়া লইলেন যে, ইলেকট্রন নয়, তবে সমপরিমাণ নেগেটিভ-তড়িৎ-যুক্ত এক নূতন মূল পদার্থ আছে; ইহা ইলেকট্রন অপেক্ষা ভারী এবং প্রোটন অপেক্ষা হাল্‌কা, ইহা পজিট্রনের ন্যায় ক্ষণজীবী এবং ইহাই শক্তির আদানপ্রদান ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিতেছে। ক্ষণজীবী বলিয়া সাধারণত ইহাকে ধরা যাইবে না, তবে

পজিট্রনের ন্যায় যখন ইহা প্রচণ্ড বেগযুক্ত হইবে তখন ইহার গতিপথ অঙ্কিত হইয়া যাইবে।

অধুনা কস্‌মিক রশ্মি লইয়া অনুসন্ধানে এমন সব রেখা মিলিল যাহা এইরূপ পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছু দ্বারা ঘটিতেছে বলিয়া কল্পনা করা যায় না। মোটামুটি হিসাবে দেখা গেল, উহা একটি ইলেকৃট্রনের প্রায় ১৫০ গুণ ভারী। ইহার নাম দেওয়া হইল মিসোট্রন (মেসন)। ইহা ক্ষণজীবী আবার দেখা গিয়াছে, সব মেসন এক রকমের নয়— কম ভরের আছে, বেশি ভরেরও আছে; নেগেটিভ তো আছেই আবার পজিটিভও আছে, তড়িৎ-শূন্যও আছে। বিজ্ঞানী নিঃসংশয়রূপে আর-একটি মূল পদার্থের সন্ধান পাইলেন।

অতএব শেষ অবধি বিশ্বের মূল উপাদান হইল—ইলেকৃট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন, মিসোট্রন (মেসন) এবং সম্ভবত নিউট্রিনো। কিন্তু এই কি শেষ কথা? ভবিষ্যৎ তাহার উত্তর দিবে। আর, বিজ্ঞানে শেষ কথা বলিয়া কিছু নাই। তবে ইহাদের সম্বন্ধে অন্য একটু কথা আছে।

উপাদানের প্রকৃতি

এই যে বিভিন্ন উপাদানের কথা বলা হইল ইহাদের স্বরূপ কি? ইলেকৃট্রনের কথাই ধরা যাক। কিন্তু সে আলোচনার পূর্বে একটু অন্য কথার অবতারণা করা যাইতেছে।

যে-সকল দূত বাহির হইতে এই পৃথিবীতে সংবাদ বহন করিয়া আনে আলোক তাহাদের মধ্যে প্রধান। আমরা মনে করি, আমরা দূরের কোনও বস্তু দেখিতেছি, তাহার রং এই, তাহার ঔজ্জ্বল্য এইরকম; কিন্তু আলোক চক্ষুমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শুধু এই কথাগুলি আমাদিগকে

জানাইতেছে, "আমি ঐ দিক হইতে আসিতেছি, আমার কম্পনসংখ্যা এই, আমি এইরূপ জোরে কাঁপিতেছি, আমার বেগের হার এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল, আমি বাহির হইবার পর আমার পিছনে কি কি ঘটিয়াছে আমি জানি না, তোমার চক্ষুর পিছনের পর্দায় গিয়া পৌছিলেই আমার মৃত্যু।"

আলোকের জন্ম হইল একস্থানে, মৃত্যু হইল অন্যত্র। জন্ম হইতে মৃত্যুর মধ্যে এই অল্প বা দীর্ঘ কাল আলোক কিরূপে যাপন করিল? সূর্য হইতে যে-আলোক নির্গত হইল ৮ মিনিট পরে তাহা পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিল। সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব ৯ কোটি মাইলেরও বেশি; আলোক এই দীর্ঘ পথ কি ভাবে অতিক্রম করিয়া আসিল? নিউটন বলিলেন, আলোকিত পদার্থ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা বাহির হইয়া প্রচণ্ডবেগে চারিদিকে ছুটিতেছে। ঐ কণিকা আসিয়া আমাদের চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের দৃষ্টির অনুভূতি জাগাইতেছে। এই মতবাদকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করিতে হইল। কারণ, দেখা গেল, বিশিষ্ট অবস্থায় দুই আলোক-রশ্মি আপনা-আপনি কাটাকাটি করে; দেখা গেল, আলোকের গতিপথ যে সোজা বলা হইয়াছিল তাহা ঠিক নয়, আলোক-রশ্মি বাঁকে, যদিও অতি অল্প পরিমাণে। এইবার কল্পনা করা হইল যে, আলোক তরঙ্গ দ্বারা প্রবাহিত হয়। তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে তবেই সেই তরঙ্গ আমাদিগের আলোকের অনুভূতি জাগায়; পৃথক পৃথক দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন রঙের চেতনা আনে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য মাপিবার বিভিন্ন উপায় স্থিরীকৃত হইল। তরঙ্গ তো স্থির হইল, কিন্তু প্রশ্ন উঠিল কিসের তরঙ্গ? পৃথিবীর উপরে কিছুদূর অবধি গিয়া তো বায়ু শেষ হইয়াছে, তাহার পর শূন্য; কল্পনা করিতে হইল যে, যাবতীয় পদার্থ ব্যাপিয়া,

সকল শূন্যস্থান ব্যাপিয়া, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া এরূপ কিছু আছে যাহার মধ্য দিয়া তরঙ্গ পরিচালিত হয়। ইহার নাম দেওয়া হইল ঈথর। এই ঈথর সম্বন্ধে শুধু এইটুকু ধরিয়া লওয়া হইল যে, উহা কাঁপে—কিন্তু ঐ অবধি, উহার আর কোনও খবর জানা রহিল না। আলোক সম্বন্ধে সকলরকম পরীক্ষা এই মতবাদকে সমর্থন করিল। ক্রমে দেখা গেল যে, এক্স্-রশ্মি, গামা-রশ্মি, তাপ-রশ্মি সবই ঈথর-তরঙ্গ ; যাহা দ্বারা বিনা তারে বার্তা প্রেরিত হয় তাহাও ঈথর-তরঙ্গ ; সকলেই একজাতীয়, পার্থক্য যাহা-কিছু সে শুধু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এক-একটি মতবাদের প্রতিষ্ঠার এক-একটি যুগ আসে ; বিজ্ঞানী উহাকে লইয়া খুব হৈ চৈ করেন ; চারিদিকে উহার জয়জয়কার হয় ; তাহার পর এমন-সব ঘটনা দেখা যায়, যাহার ফলে বিজ্ঞানী তাঁহার এই সাধের অট্টালিকাকে নিজ হাতেই চূর্ণ করেন। সুদীর্ঘ দুইশত বর্ষকাল ধরিয়া এই তরঙ্গবাদ আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল ; তাহার পর এমন-সব ঘটনা দেখা দিল যাহাতে বিজ্ঞানী বলিলেন,—'তাই তো'।

মনে করা যাক, একটি মস্ত হ্রদ আছে। এপারে ২০ ফুট উঁচু হইতে জলের উপর একটি ঢিল ফেলা হইল। জলে তরঙ্গ উঠিল ; তরঙ্গ অগ্রসর হইতে লাগিল, জলকণা প্রতি স্থানেই উঠানামা করিতেছে ; কিন্তু তরঙ্গ যতই অগ্রসর হইতেছে জলকণার উঠানামা ততই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ওপারে যখন আসিয়া পৌঁছিল তখন উঠানামা খুবই অল্প হইয়া গিয়াছে। এইরূপ তরঙ্গ এখানে পৌঁছিয়া একটি ঢিলের গায়ে লাগিয়া ঐ ঢিলটিকে ২০ ফুট উঁচুতে তুলিবে একথা কি বিশ্বাসযোগ্য ? কিন্তু দেখা গেল, প্রকৃতিতে এই-রকমের ব্যাপার ঘটিতেছে। একটা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

এক্‌স্‌-রশ্মির উদ্ভব এইভাবে হয়। প্রায় বায়ুশূন্য এক গোলকে ধাতব পদার্থের উপর কতকগুলি ইলেক্‌ট্রন প্রচণ্ডবেগে আসিয়া ধাক্কা দেয়; সংঘাতের ফলে এক্‌স্‌-রশ্মি বাহির হইয়া আসে। ঐ ইলেক্‌ট্রনের বেগ কত তাহা সঠিক ভাবে মাপা যায়। এক্‌স্‌-রশ্মি উদ্ভূত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; যত অগ্রসর হইল রশ্মি ততই ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। খুব ক্ষীণ অবস্থাতেও ইহা যদি কোনও ধাতব পদার্থের উপর পড়ে তবে উহা হইতে ইলেক্‌ট্রন বাহির হয়। এই ইলেক্‌ট্রনের বেগ মাপা গেল; দেখা গেল কাচের গোলকে যে বেগে ইলেক্‌ট্রন আসিয়া এক্‌স্‌-রশ্মি উৎপন্ন করিয়াছিল, কোনও পদার্থের উপর এক্‌স্‌-রশ্মি আসিয়া পড়ায় তাহা হইতে ঠিক সেই একই বেগে ইলেক্‌ট্রন বাহির হইয়া আসিল। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ঐ এক্‌স-রশ্মি বাহির হইয়াই তীব্র অবস্থায় কিছুর উপর পড়ুক বা অনেক দূর যাইয়া মৃদু হইয়া তাহার উপ পড়ুক একই বেগে ইলেক্‌ট্রন ছিটকাইয়া বাহির হইবে; পার্থক্য এই, তীব্র অবস্থায় সংখ্যায় বেশী ইলেক্‌ট্রন বাহির হইবে, মৃদু অবস্থায় কম ইলেক্‌ট্রন বাহির হইবে, এইমাত্র; নির্গত ইলেক্‌ট্রনের বেগ ঠিক থাকিবে। এই-রকমের বহু পরীক্ষা হইল। দেখা গেল, নীলরশ্মি, অতি-বেগনি রশ্মি, এক্‌স্‌-রশ্মি, গামা-রশ্মি যদি নির্দিষ্ট ধাতব পদার্থের উপর পড়ে তবে উহা হইতে ইলেক্‌ট্রন বাহির হয়। বহির্গত ইলেক্‌ট্রনের বেগ নির্ভর করে যে-ঈথর-তরঙ্গ পড়িতেছে তাহার কম্পনসংখ্যার উপর, তাহার ঔজ্জ্বল্যের উপর নয়; ঔজ্জ্বল্যের উপর নির্ভর করে সংখ্যায় কতগুলি ইলেক্‌ট্রন বাহির হইল। এক্‌স্‌-রশ্মির, গামা-রশ্মির কম্পনসংখ্যা বেশী, সুতরাং উহাদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত ইলেক্‌ট্রন খুব বেশী বেগে বাহির হইবে; নীল আলোকের কম্পনসংখ্যা কম, উহা দ্বারা উত্থিত ইলেক্‌ট্রন অপেক্ষাকৃত কম বেগে বাহির হইয়া আসিবে।

রশ্মির সাহায্যে ইলেক্‌ট্রন উৎপাদন ব্যাপারটার নাম দেওয়া হইল রশ্মিতড়িৎ-ক্রিয়া; বহু পরীক্ষাগারে অনেক বিজ্ঞানী এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষায় কোনও ভুল নাই; কিন্তু ইহার মূল কারণ কি।

আইনস্টাইন ইহার কারণ নির্দেশ করিলেন। এজন্য তিনি বর্তমান কালের পদার্থবিদ্যার একটি বিপ্লবকারী মতবাদ গ্রহণ করিলেন। তাপ দৃশ্য আলোক, অতি-বেগনি আলোক, এক্‌স্‌-রশ্মি, গামা-রশ্মি, সবই তরঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে; তরঙ্গের একটা অবিচ্ছিন্নতা, একটা ধারাবাহিকতা আছে, এই কথাই এতদিন বলা হইতেছিল। উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ হইতে যে-সব কিরণ নির্গত হয় তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে প্লাঙ্ক দেখিলেন যে অনেকগুলি ঘটনা তরঙ্গবাদ দ্বারা মীমাংসিত হয় না। প্লাঙ্ক বলিলেন যে, তেজ বিচ্ছিন্নভাবে খণ্ড খণ্ড আকারে বাহির হইয়া যায়, অবিচ্ছিন্নতা নাই, ধারাবাহিকতা নাই; শক্তি এক-একটি গুচ্ছে, এক-একটি প্যাকেটে, এক-একটি বাণ্ডিলে বাহির হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা নূতন কথা এই যে, শক্তির একক (unit) সর্বত্র ঠিক নাই; কম্পনসংখ্যা যেখানে কম বাণ্ডিলটা সেখানে ছোট, কম্পনসংখ্যা যেখানে বেশী বাণ্ডিলটা সেখানে বড়। শক্তির গুচ্ছকে লাল আলোর জন্য যদি ১ ধরা হয়, বেগনি আলোর পক্ষে উহা হইবে ২, অতি-বেগনির পক্ষে ৮ এবং এক্‌স্‌-রশ্মির পক্ষে ৮০০০, গমা-রশ্মির পক্ষে আরও বেশী। এই মতবাদ গ্রহণ করিয়া আইনস্টাইন বলিলেন যে, শুধু রশ্মি-নির্গম ব্যাপার নয়, রশ্মি যখন একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিচালিত হয় তখনও উহা বিচ্ছিন্নভাবে গমন করে। এই কোয়ান্টম্‌বাদ অনুসারে দাঁড়াইল যে, আলোক বা যে-কোনও রশ্মি কোথাও কদাচ মসৃণ তরঙ্গ নয়, সর্বত্রই উহা বিচ্ছিন্নভাবে, কাটাকাটা

রকমে প্রবাহিত হইতেছে। ধাতব পদার্থের উপর রশ্মি নিপতিত হইলে যে ইলেকট্রন বাহির হয়, এই রশ্মি-তড়িৎ-ক্রিয়া আইনস্টাইন কোয়ান্টম-বাদ দ্বারা মীমাংসা করিলেন। রশ্মির এক-একটি প্যাকেটের নাম দেওয়া হইল 'ফোটন', ইহা যেন প্রোটন ইলেকট্রনের সহোদর। এক্স্-রশ্মি বাল্বের মধ্যে একটি ইলেকট্রন আসিয়া ধাক্কা খাইয়া যখন এক্স্-রশ্মি উৎপাদন করিল তখন এই ইলেকট্রনের সমস্ত শক্তি ফোটনে চালিত হইল। এই ফোটন আলোকের বেগে বাহির হইয়া আসিল; আসিয়া যখন আবার একটি ধাতব পদার্থের উপর পড়িল তখন উহা হইতে ইলেকট্রন বাহির হইল; এখানে ব্যাপারটা উলটাইয়া গেল, ফোটনের মৃত্যু হইল এবং ইলেকট্রনের জন্ম হইল, ফোটন তাহার সমগ্রশক্তি ইলেকট্রনকে দিয়া দিল। যুক্তির কোথাও কোনও গলদ রহিল না। এই কল্পনায় যেন বহুকাল পূর্বের নিউটনের কণাবাদ অন্যভাবে দেখা দিল।

এ সব তো হইল অনেক অবান্তর কথা। আসল কথা ছিল এই যে, বিশ্বের উপাদান বলিয়া যাহাদিগকে স্থির করা গেল তাহাদের স্বরূপ কি। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে, পদার্থ যেন কতকগুলি কণিকার সমষ্টিমাত্র। কিন্তু আলোকের যদি দুই মূর্তি হয় তবে পদার্থের উপাদান ইলেকট্রন কি দুইভাবে আপনাকে প্রকাশিত করিতে পারে না—কণিকা ও তরঙ্গ? ডি. ব্রগ্‌লি এই কথা ভাবিলেন, জটিল আঁকজোখের অবতারণা করিলেন, হিসাবে দেখাইলেন যে, একটি ইলেকট্রনের সহিত তরঙ্গ জড়িত আছে; প্রচণ্ডগতিযুক্ত ইলেকট্রনের পক্ষে তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক্স্-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমপর্যায়ে। ডি. ব্রগ্‌লি আরও বলিলেন যে, পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের ঘুরিবার কক্ষদৈর্ঘ্য সব সময় উহার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের গুণিতক। ক্রমে দেখা গেল যে, এক্স্-রশ্মি ও ইলেকট্রনদের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। পরীক্ষায় ডেভিসন ও জার্মার ইহা প্রথম প্রতিপন্ন করিলেন;

নিকেলের উপর ইলেক্‌ট্রন ফেলিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, উহার প্রতিফলন ব্যাপারটা দানাযুক্ত পদার্থের উপর এক্‌স্‌-রশ্মির প্রতিফলনের তুল্য। জে. জে. টম্‌সনের পুত্র জি পি টম্‌সন কেলাসিত (crystalline) পদার্থের ভিতর দিয়া ইলেক্‌ট্রন পাঠাইয়া এক চিত্র পাইলেন; বহু বৎসর পূর্বে ব্র্যাগ ঐ-সব পদার্থের মধ্য দিয়া এক্‌স্‌-রশ্মি পাঠাইয়া অনুরূপ চিত্র পাইয়াছিলেন। শেষ অবধি কি তরঙ্গ দাঁড়াইল পদার্থে, পদার্থ দাঁড়াইল তরঙ্গে?

স্রডিংগার এই মতবাদকে আর-এক ধাপ উপরে তুলিলেন। তিনি বলিলেন, স্থূল ইলেক্‌ট্রনকে বাদ দেওয়া যাক; শুধুই তরঙ্গ আছে, আর কিছু নয়। কিন্তু, নলে যে ক্যাথোড-রশ্মি বাহির হয়, তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে যে বিটা-রশ্মি বাহির হয়, উহারা তো ইলেক্‌ট্রন। স্রডিংগার বলিলেন, না, উহারাও তরঙ্গ। কেন্দ্রের চারিদিকে ইলেক্‌ট্রন ঘুরিতেছে, বোর এই কল্পনা করিয়াছিলেন। স্রডিংগার ব্যাপারটিকে এইভাবে দেখিলেন। কেন্দ্রের চারিদিকে তড়িৎ বিস্তৃত হইয়া আছে; এই তড়িতের প্রাচুর্য নির্দিষ্টহারে বাড়িতেছে কমিতেছে; ইহার ফলে তরঙ্গের উৎপত্তি হইতেছে; ইলেক্‌ট্রন লাফাইয়া পড়িতেছে বলিয়া বোর উহার উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছিলেন। স্রডিংগার তরঙ্গবাদের উপর স্থাপিত করিয়া এক নূতন বলবিদ্যা গঠিত করিলেন। বোরের কল্পনা অনুসারে যে-সব ব্যাপার নির্ণীত হইতেছিল এই নূতন তরঙ্গ-বলবিদ্যা দ্বারা তাহা তো হইলই, অধিকন্তু ইহা আরও ব্যাপক হইল। বর্ণালিরেখার ঔজ্জ্বল্যও ইহার দ্বারা সুমীমাংসিত হইল।

স্রডিংগার যখন তাঁহার এই মতবাদ প্রচার করিলেন তাহার কিছু পূর্ব হইতে হাইসেনবার্গ্‌ কোয়াণ্টম্‌বাদের উপর স্থাপিত বলবিদ্যাকে এক নূতন রূপ দিলেন। ইহাতে পরমাণুর চিত্রের কোনও কল্পনা নাই;

ইহাতে আছে কতকগুলি আঁকজোখ, কতকগুলি হিসাব, কতকগুলি ব্যবস্থাপত্র যদ্দ্বারা প্রাচীন বলবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ঘটনাসমূহ নিখুঁত ভাবে মীমাংসিত হইতে পারে। হাইসেনবার্গের যুক্তির ধারা পদার্থ-বিদ্যাকে দর্শনশাস্ত্রের কিনারায় লইয়া গেল। যুক্তির মধ্যে যন্ত্রপাতির কোনও স্থান নাই, থাকিতে পারে না; ইহার একমাত্র সম্বল হইল মানবের অন্তরস্থ বুদ্ধি। যুক্তির ধারা মোটামুটি এই। মনে করা যাক, দূরে একখানা পাথর রহিয়াছে, আমি উহাকে দেখিব, উহার মাপজোখ লইব। দেখিবার জন্য উহার উপর আলোক ফেলিলাম। আলোক পাথরের উপর পড়িয়া উহাকে স্থানচ্যুত করিবে না, সুতরাং আমার মাপজোখে কোনও ভুল হইবে না। তারপর কোনও বস্তুর যদি গোড়াকার অবস্থা জানা থাকে এবং উহার চলিবার নিয়মকানুন যদি জ্ঞাত হওয়া যায় তবে পরে যে-কোনও সময় উহার অবস্থিতি আমরা নির্ধারণ করিতে পারি। হাইসেনবার্গ্ বলিলেন যে, পরমাণুর সম্বন্ধে এ-সব নিয়ম খাটিতে পারে না; পরমাণুর পূর্ব অবস্থা তো আমরা রশ্মির সাহায্যে নির্ধারণ করিব। রশ্মি পরমাণুর মধ্যে যদি ক্রিয়া চলে তবে মাপজোখ হইবে কিরূপে? অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে যে-সব যুক্তির ধারা গৃহীত হইয়াছে পরমাণুজগতে সে-সব যুক্তি চলে না। বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তি তবে কি একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল? তবে কি বিজ্ঞান ভবিষ্যতের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না, এবং যদি পারে তো গোড়াকার অবস্থা সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া একেবারে ভবিষ্যদ্বাণী করে? হাইসেনবার্গের মতে শেষ অবধি কি এই দাঁড়াইল যে, পরমাণু-জগৎ সম্বন্ধে আমরা কোনও দিন কোনও জ্ঞানলাভ করিতে পারিব না? এ কথা কোনও নির্দ্দিষ্ট পরমাণু সম্বন্ধে ঠিক; তবে আমরা সোজাসুজি একটা সমষ্টিগত হিসাব পাইব। প্রাচীন পদার্থবিদ্যায় যে গড় হিসাব

লওয়া হয় তাহার সহিত পার্থক্য এই যে, সেখানে প্রত্যেকটির উপর নিয়ম খাটাইয়া ফলাফলের একটা গড় লওয়া হয়; এখানে সমষ্টিগত হিসাব সোজাসুজি আসে, প্রত্যেকটির অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নাই।

পরীক্ষামূলক ঘটনায় তরঙ্গবলবিদ্যা প্রয়োগে দুইটি আপত্তির কারণ দেখা দিল। ইলেকট্রনের আবর্তন হইতেছে ধরিয়া যে-সব ঘটনা মীমাংসিত হইয়াছিল ইহা সে সব ব্যাপার নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইল। তাহা ছাড়া প্রাচীন বলবিদ্যা ইহার ভিত্তি হওয়ায় আপেক্ষিকতাবাদ হইতে যে-সব সিদ্ধান্ত আসে সে-সব এখানে খাপ খায় না।

১৯২৮ সালে ডিরাক একসঙ্গে এই দুই আপত্তিরই খণ্ডন করিলেন। শ্রডিংগারের গণনাসমূহে ডিরাক যে পরিবর্তন আনিলেন তাহাতে উহা সত্যে পৌছিবার পথে আরও কতকদূর অগ্রসর হইল।

কিন্তু পূর্ণসত্য কতদূরে? যত দিন যাইতেছে ততই মানব বিশ্ব সম্বন্ধে নব নব জ্ঞান, গভীরতর জ্ঞান আহরণ করিয়া চলিয়াছে বটে, কিন্তু ততই সে তাহার অজ্ঞানতার অন্ধকার উপলব্ধি করিতেছে। বহুকাল পূর্বে নিউটন বলিয়াছিলেন, "আমি বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ডের সংকলন করিতেছি মাত্র, জ্ঞান-মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।" নিউটনের পর দীর্ঘ দুই শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখিয়া সাধারণ মানব আজ স্তম্ভিত, কিন্তু বিজ্ঞানী তবুও আজ নিউটনের ঐ বাক্য একই ভাবে উচ্চারণ করিতেছেন।

শক্তি ও তড়িৎ

প্রথম যুগে বিজ্ঞানীরা স্থির করিলেন যে, বিশ্বের মূল উপাদান হইল বিভিন্ন রকমের পরমাণু। ইহারা বিভিন্ন গুণাবলির; ইহারা অবিভাজ্য। ইহাদের সংখ্যা দাঁড়াইল ৯২টিতে।

তাহার পর পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল যে, একটি পরমাণু হইতে বিযুক্ত হইয়া অতি ক্ষুদ্র কণিকা বাহির হয়; ইহারা নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত। ইহাদের নাম দেওয়া হইল ইলেক্‌ট্রন। পজিটিভ তড়িৎযুক্ত ইহাদের জুড়িদারদের সন্ধান চলিল। সন্ধান মিলিল। উহাদের নাম দেওয়া হইল প্রোটন। দেখা গেল, পরমাণুমাত্রই ইলেক্‌ট্রন-প্রোটনের সমষ্টি, অতএব পরমাণুকে আর বিশ্বের মূল বলা চলিল না। পরমাণুকে ভাগ করিয়া যাহা পাওয়া গেল সেই প্রোটন-ইলেক্‌ট্রন বিশ্বের মূল উপাদান বলিয়া পরিগণিত হইল।

পরে আর-কতকগুলি কণিকার সন্ধান মিলিল; তাহারা ইলেক্‌ট্রন প্রোটন নয়, অথচ ঐ-জাতীয়। ইহারা বিশ্বে ছড়াইয়া আছে, তবে ইহাদের জীবিতকালের পরিমাণ অত্যন্ত কম, একটি সেকেণ্ডের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। সেই কারণে পরীক্ষার বিপুল আয়োজন করিয়া ইহাদিগের সন্ধান মিলিল। ইলেক্‌ট্রন-প্রোটনের ন্যায় ইহাদিগকেও বিশ্বের উপাদান বলিয়া ধরা হইল।

ইহার পর অন্য একটি প্রশ্ন দেখা দিল। এই সব উপাদান তো অবিভাজ্য; কিন্তু ইহারা কি পরিবর্তনশীল? পজিট্রন প্রভৃতি তো প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু ইলেক্‌ট্রন প্রোটন? অন্য আর-কিছু হইতে কি ইলেক্‌ট্রন-প্রোটনের উৎপত্তি হইতেছে এবং অপর কিছুতে কি উহারা বিলীন হইয়া যাইতেছে? এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের সাক্ষ্য অনুসন্ধান করা যাক।

একটি পরমাণু যদি পূর্ণসংখ্যক ইলেক্‌ট্রন-প্রোটনের সমষ্টি হয় তবে ইহার আণবিক ওজন একজোড় ইলেক্‌ট্রন-প্রোটন অর্থাৎ একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর গুণিতক হইবে; উহাতে ভগ্নাংশ আসিতে পারে না। আচ্ছা, হিলিয়ামের আণবিক ওজন ধরা যাক; উহা ৪·০০৩৮৪।

হাইড্রোজেনের আণবিক ওজন ১'০০৮১৩; হাইড্রোজেনের আণবিক ওজনের অর্থ একজোড় ইলেকট্রন-প্রোটনের ওজন। হিলিয়মে যদি ২ নিউট্রন+২ প্রোটন+২ ইলেকট্রন (বাহিরে) থাকে তবে হিলিয়মের আণবিক ওজন হওয়া উচিত ৪'০৩৪১৮; কিন্তু তাহা না হইয়া ৪'০০৩৮৪ হইল কিরূপে।

পদার্থ অবিনশ্বর, ইহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই—বহু পূর্ব হইতে বিজ্ঞান এই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইহার উপর সে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। আইনস্টাইন বলিলেন, কথাটার একটু পরিবর্তন করিতে হইবে। তিনি বলিলেন যে, পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়; এতটুকু পদার্থের বিলোপে কত-পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হয় আইনস্টাইন তাহারও একটা হিসাব দিলেন। প্রচণ্ড এ শক্তি! ঠিক করা হইল যে, ইলেকট্রন-নিউট্রন-প্রোটন লইয়া হিলিয়ম-পরমাণু যখন প্রথম গঠিত হয় তখন একটুখানি পদার্থ ('০৩০৩২) বিনষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে বহুপরিমাণ শক্তি বাহির হইয়া যায়। হিসাবে দাঁড়াইল একটি হিলিয়ম-পরমাণুর উৎপত্তির জন্য পদার্থের বিলোপে যে শক্তির উদ্ভব হইবে, তাহা একটি তিন কোটি বিভবের (potential) তড়িৎ দ্বারা চালিত একটি ইলেকট্রনের শক্তির সমান।

সূর্যের এত তেজ কোথা হইতে আসিতেছে। এখনকার সিদ্ধান্ত এই, বস্তুর রূপান্তরে সূর্যের এই তেজ। হাইড্রোজেনের প্রোটন হিলিয়মে রূপান্তরিত হইতেছে, ফলে কিছু পদার্থ শক্তির রূপ লইতেছে।

এখন, সূর্যে যাহা হইতেছে পৃথিবীতে অনুরূপ ব্যাপার ঘটানো কি সম্ভব নয়? বিজ্ঞানী অ্যাটম বোমার সৃষ্টি করিলেন, বিশেষ রকমের অল্প একটু পদার্থ প্রচণ্ড শক্তি রূপে দেখা দিল।

এখন অন্য এক প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা যাক। পদার্থ শক্তিতে

রূপান্তরিত হইতেছে, কিন্তু ইহার বিপরীত প্রক্রিয়া কি সম্ভব যে, শক্তি অন্তর্হিত হইতেছে এবং সেই অনুপাতে পদার্থের জন্ম হইতেছে? তাহাও হইতেছে; প্রমাণ মিলিল।

একজোড়া পজিট্রন-ইলেকট্রনের যে ভর তাহার তুল্যমূল্য রশ্মির শক্তি হইল দশ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট। তাহা হইলে অন্তত এই পরিমাণের শক্তি না হইলে একজোড় পজিট্রন ইলেকট্রনের উদ্ভব সম্ভব নয়। কোথায় মিলিবে এ শক্তি? দেখা গেল, থোরিয়ম C" হইতে নির্গত গামা-রশ্মির শক্তি ২৬ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট। উইল্‌সনের কক্ষমধ্যেই এই গামা-রশ্মি নির্গত হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ফটোগ্রাফ লওয়া হইল। ফটোগ্রাফ হইতে দেখা গেল যে, পজিট্রন ও ইলেকট্রনের সৃষ্টি হইতেছে এবং শুধু তাহা নয়, গণনাটি আর-একদিক হইতে বিস্ময়কররূপে মিলিয়া গেল। ২৬ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তির ১০ লক্ষ যদি পজিট্রন-ইলেকট্রনের উৎপত্তিতে ব্যয়িত হয়, তবে অবশিষ্ট ১৬ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি ঐ পজিট্রন ইলেকট্রনের মধ্যে বণ্টন হইবে। পরীক্ষায় ইহাও প্রতিপন্ন হইল।

পদার্থ যদি শক্তির অভিব্যক্তি হয় তবে বিশ্বের মূল হিসাবে আর ইলেকট্রন প্রভৃতিকে ধরা কেন, কেবল শক্তিকেই তো বিশ্বের মূল উপাদান বলা চলে। অবশ্য, উহার উপর যোগ করিতে হয় তড়িৎ। শেষ অবধি তাহাই দাঁড়াইল।

এই ব্রহ্মাণ্ডের বিশালত্ব সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে। এক দেবদূত মানবকে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছিল। যতই অগ্রসর হয় সম্মুখে ততই সীমাহীন পথ দেখিয়া সেই যাত্রী থামিয়া পড়িল, কাঁদিতে কাঁদিতে দেবদূতকে বলিল, "আর আমি অগ্রসর হইব না; সম্মুখে কোনও সীমা দেখিতেছি না, এই সীমাহীনতা আমার

মনকে পীড়া দিতেছে, আমার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, এই-খানেই আমার যাত্রা শেষ করিব।" দেবদূত তখন অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "ভগবানের এ রাজত্বের শেষ নাই, আবার দেখো, আরম্ভও নাই।"

এই ব্রহ্মাণ্ড! কিন্তু ইহা যতই বিরাট হোক, যতই কল্পনাতীত হোক, ইহার মূলে রহিল মাত্র দুইটি কথা—শক্তি ও তড়িৎ। পদার্থ শক্তির রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র, কিন্তু শক্তির হ্রাসও নাই বৃদ্ধিও নাই; শক্তি অবিনশ্বর। আর তড়িৎও অবিনশ্বর।

এই অবিনশ্বরের পর্যায়ে অন্য দুইটা কথা আসিয়া পড়ে, তাহা হইল ভরবেগ (momentum) এবং কৌণিক ভরবেগ (angular momentum)।

উপসংহার

প্রসঙ্গক্রমে কথাটা উঠিয়াছে যে, পদার্থ হইল শক্তির রূপান্তরিত অবস্থা। মানব ঔৎসুক্যের সহিত প্রশ্ন করিতেছে, আজও কি পদার্থের জন্ম হইতেছে এবং যদি হয় তবে কোথায় কিভাবে হইতেছে। সম্পূর্ণ উত্তর সে আজও পায় নাই, তবে বর্তমান কালের বিভিন্ন পরীক্ষা হইতে মনে হয়, যেন তিমিরদুয়ার একটু একটু করিয়া খুলিয়া যাইতেছে। এই-সব পরীক্ষার সামান্য একটু আভাস দেওয়া হইতেছে।

রেডিয়ম, এক্‌স্‌-রশ্মি যখন আবিষ্কৃত হয় সেই সময় হইতে দেখা গিয়াছিল যে, উহাদের চারিদিকের গ্যাস তড়িৎ-পরিবাহক হয়। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে গাইটেল তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে কোনও রকম রশ্মি আসিতে না পারে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াও দেখিলেন যে, বায়ুকে সম্পূর্ণরূপে তড়িৎপরিবাহকত্বহীন করা যায় না। তাহার পর গোকেল, হেস, কোল্‌হর্‌স্‌টার স্বর্ণপত্রযুক্ত তড়িৎ-নির্দেশকযন্ত্র (gold-leaf electroscope) খুব উচ্চে লইয়া গেলেন; তড়িৎপরিবাহকত্ব কমিল না বরং দেখা গেল, পাঁচ মাইল উচ্চে উহা সাতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। গাইটেলের পরীক্ষা সম্বন্ধে এতদিন রাদার্‌ফোর্ড্‌ বলিয়া আসিতেছিলেন যে, মাটির মধ্যে লুক্কায়িত কোনও তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে নির্গত রশ্মি দ্বারা ঐরূপ ঘটিতেছে। কিন্তু এখন আর সে কথা বলা চলিল না। মাটি হইতে যদি ঐ রশ্মি নির্গত হয় তবে পাঁচ মাইল পথ ভ্রমণ করিবার পর উহা হয় লুপ্ত হইবে না-হয় খুব কমিয়া যাইবে, বাড়িয়া যাইতে পারে না। নিশ্চয় পৃথিবীর বাহির হইতে আগত কোনও রশ্মি দ্বারা ঐরূপ ঘটিতেছে।

১৯১৪ সালে মিলিক্যান এ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের জন্য কাজ বেশীদূর অগ্রসর হইল না। ১৯২১ সালে মিলিক্যান এ সম্বন্ধে আবার মনোনিবেশ করিলেন। পর্বতশিখরে, গভীর হ্রদে, আকাশে খুব উচ্চে এই রশ্মির তীব্রতা সম্বন্ধে মিলিক্যান অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। তিনি একটি যন্ত্র নির্মাণ করিলেন যাহাতে উষ্ণতা, বায়ুর চাপ, তড়িৎ-নির্দেশক যন্ত্রে পাতা মুড়িবার হার, স্বতই লিখিত হয়। যন্ত্রটির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, উহা ওজনে মাত্র সাত আউন্স্। ইহার সহিত দুইটি বেলুন যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল, স্ফীত অবস্থায় প্রত্যেকটির ব্যাস ১৮ ইঞ্চি মাত্র। বেলুন দুটি হালকা গ্যাসে ভরিয়া দেওয়ায় উহারা উপরে উঠিতে লাগিল। খুব বেশী উঁচুতে উঠিয়া একটি ফাটিল; তখন আর-একটি প্যারাস্যুটের ন্যায় কাজ করিল এবং সমস্তটি ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল। একটি পরীক্ষায় যন্ত্রটি প্রায় ১০ মাইল ঊর্ধ্বে উঠিল; সেখানে শৈত্য—৬০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড; উঠিতে সময় লাগিয়াছিল ১১৫ মিনিট, নামিতে ৭৬ মিনিট। এই দশ মাইলের মধ্যে পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ুর প্রায় ১০ ভাগের ৯ ভাগ আছে। পরীক্ষায় কয়েকটি ব্যাপার লক্ষিত হইল। যত উপরে উঠা যায় রশ্মির তীক্ষ্ণতা তত বাড়ে এবং যে হারে বাড়ে তাহাতে এই প্রমাণ হয় যে, এই রশ্মি বায়ু দ্বারা খুবই অল্প পরিমাণে শোষিত হয়। জলের মধ্য দিয়া যাইলেও রশ্মির তীব্রতা যে খুব অল্প পরিমাণে হ্রাস পায়, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নানা পরীক্ষা হইতে তাহা প্রমাণিত হইল। সকল পরীক্ষা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা হইল যে, এই রশ্মির উৎপত্তি পৃথিবীর কোথাও নয়, কোনও নির্দিষ্ট দিক হইতে ইহা আসিতেছে না, ইহা ছায়া ফেলে না। মিলিক্যান বলিলেন পৃথিবী হইতে দূরে, বহুদূরে, সরল মৌলিক পদার্থ হিলিয়ম, কার্বন, সিলিকন প্রভৃতিতে পরিণত হইতেছে; তজ্জনিত যে শক্তির

উদ্ভব তাহারই কিছু ঐ রশ্মিরূপে পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিতেছে। ইহার নাম দেওয়া হইল কস্‌মিক রশ্মি। পরে প্রমাণিত হইল, এই কস্‌মিক রশ্মি ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন, পজিট্রন ও মেসন-এর সমষ্টি, কিছু ফোটন থাকাও সম্ভব। ষাট হাজার কোটি ভোল্ট শক্তিযুক্ত ইলেক্‌ট্রন মিলিল।

পদার্থের ধ্বংসে এই শক্তির উৎপত্তি। কিন্তু উৎপত্তির স্থান কোথায়, কত দূরে? কিছু কিছু অনুমান হইতেছে, সঠিক সংবাদ মিলে নাই, তবে এটা ঠিক যে, উহারা লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ অতিক্রম করিয়া আসিতেছে। বিজ্ঞানীর পরীক্ষা শেষ হয় নাই; আজও গাইগারের কক্ষে বিজ্ঞানী উহাদের আগমন লক্ষ্য করিতেছে, বায়ুস্তরে বেশীরকম প্রবেশ করিয়া পরমাণুকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার পূর্বে আজও বেলুন পাঠাইয়া উহাদিগকে ধরা যাইতেছে। কিন্তু উহাদের সম্বন্ধে কত সংবাদ এখনও জানিতে বাকী! এই মুহূর্তে একটি মানবদেহে কত কণিকা আসিয়া পড়িতেছে? মিনিটে হয়তো ৩০টি, ঘণ্টায় ১৮০০, দিনে ৪৩২০০, বৎসরে ১৫৭৬৮০০০। উহারা আমাদের অনিষ্ট করে না উপকার করে, না কিছুই করে না? উহাদের অভাবে আমরা নির্জীব হইয়া আসি না উহাদের সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নির্বিকার? এসব কথা বিজ্ঞানী এখনও জানে না। কিন্তু সৃষ্টির রহস্যজাল উদ্ঘাটনে বিজ্ঞানী চিরদিনই অসাধ্যসাধন করিয়া আসিতেছে, বন্ধুর পথে সে যাত্রা করিতেছে, নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে না। এ সম্বন্ধে একটি দুঃসাহসিকতার কাহিনী এইরূপ। ঊর্ধ্বে এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য পিকার্ড্ নামে এক বিজ্ঞানী এক নূতন ধরনের বেলুন নির্মাণ করিলেন এবং তাহাতে নিজে চড়িলেন। বেলুন উপরে উঠিতে লাগিল। সূর্যাস্তের পরে পিকার্ড যাত্রা করিলেন; উঠিতে

উঠিতে রাত্রি শেষ হইল, সূর্যকিরণ দেখা দিল; সূর্যের অতিবেগনি রশ্মি এত তীব্র যে চোখে পড়িলে মুহূর্তের মধ্যে অন্ধ করিয়া দিবে। এরোপ্লেন পূর্বে সর্বোচ্চ ৪৭৫৭২ ফুট অবধি উঠিয়াছিল, পিকার্ড্ তাহারও উপর আরও ৬০০০ ফুট উঠিলেন; বেলুন আর উঠিল না, তাই পিকার্ড্‌কে সেখানে থামিতে হইল এবং ২০ ঘণ্টা পরে সেখানকার অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

বিজ্ঞানী মনে করেন যে, কস্‌মিক রশ্মি সম্বন্ধে যখন আরও অনেক পরীক্ষা হইবে তখন মানব পদার্থের সৃষ্টি ও ধ্বংস সম্বন্ধে অনেক তথ্য আহরণ করিবে। তবে কবি যে প্রশ্ন করিতেছেন—

অবশিষ্ট অমেয় আলোকধারা
পথহারা
আদিম দিগন্ত হতে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে নিরুদ্দেশ স্রোতে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে অপার তিমির-তেপান্তরে
অসংখ্য নক্ষত্র হতে রশ্মিপ্লাবী নিরন্ত নির্ঝরে
সর্বত্যাগী অপব্যয়,
আপন সৃষ্টির 'পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়।
কিংবা এ কি মহাকাল কল্পকল্পান্তের দিনে রাতে
এক হাতে দান ক'রে ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে।
সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যুগে যুগে কাড়াকাড়ি যেন,
কিন্তু কেন।

এ 'কেন'র উত্তর কিন্তু বিজ্ঞানের নিকট হইতে কোনও দিন মিলিবে না।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বপরিচয় ১॥০

পঞ্চম সংস্করণ। নবম মুদ্রণ

সুরেন ঠাকুর

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ২।০

দ্বিতীয় মুদ্রণ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ২।০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত

পৃথ্বীপরিচয় ১।০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণতত্ত্ব ১॥০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

আহার ও আহার্য ১।০

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যের কথা ১॥০

তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাস ২৲

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারত-দর্শনসার ৩।০

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির পরাজয় ১॥০

শ্রীনির্মলকুমার বসু

হিন্দুসমাজের গড়ন ২॥০